

গৌড়রাজমালা

গৌড়রাজমালা

রমাপ্রসাদ চন্দ

সাম্রাজিক তথ্য সম্বলিত ভূমিকা লিখেছেন

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

নবভারত



পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম নবভারত সংস্করণ
মার্চ ১৯৭৫

© সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
মুদ্রাকর : আর সাহা, প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী (ব্লক কে-৩ম্নান), কলি-৬

॥ উৎসর্গ ॥

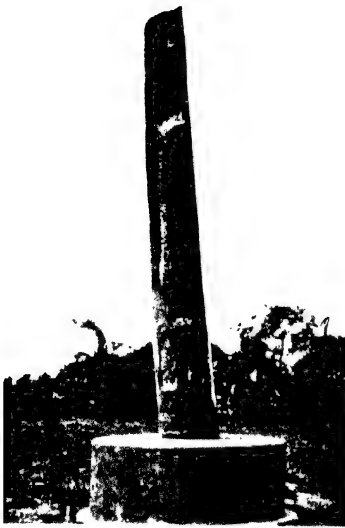
যিনি সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময় হইতেই, পুরাতত্ত্বানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহার চর্চার সূত্রপাত করিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই দীর্ঘাতিয়াধিপতি অনরেবল রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের তৃতীয়-পুত্র-প্রবর্তিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সঙ্কলিত “গোড়-বিবরণ” তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সমাদর-রক্ষার্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

। শুভমস্ত ।

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
উপক্রমগিকা	
১। গঙ্গরিডি	১
২। গুপ্ত-সাম্রাজ্য	৪
৩। গোঁড়াধিপ-শশাঙ্ক	৭
৪। গোড় ও কাশ্মীর	১১
৫। গোড়ে বৎসরাজ	২৩
৬। মাৎস্যহ্যায়—গোপাল	২৪
৭। ধর্মপাল	২৬
৮। ধর্মপাল ও নাগভট্ট	৩০
৯। ধর্মপাল ও মিহিরভোজ	৩২
১০। দেবপাল	৩৪
১১। দেবপালের দিঘিজয়	৩৫
১২। প্রথম বিগ্রহপাল	৩৮
১৩। কাহ্নোজ্জায়য়-গোড়পতি	৪১
১৪। রাজেন্দ্রচোলের অভিযান	৪৬
১৫। মহীপালের কীর্তিকালাপ	৪৮
১৬। নয়পাল	৫১
১৭। রামপাল	৫৭
১৮। কৈবর্ত্য বিদ্রোহ	৫৯
১৯। মদনপাল	৬২
২০। গোবিন্দপাল	৬৫
২১। আদিশূর	৬৮
২২। ভট্ট-ভবদেব	৭১
২৩। বিজয়সেন	৭৩
২৪। দান সাগরের রচনাকাল	৭৫
১৫। বিজয়সেন	৭৯

২৬।	বল্লালসেন	৮০
২৭।	লক্ষ্মণসেন	৮০
২৮।	হিন্দুস্থানে তুর্ক	৮২
২৯।	মহম্মদ-ই-বখতিয়ার	৮৬
৩০।	বিহার-বিজয়	৮৭
৩১।	লক্ষ্মণাবতী ও নোদিয়া	৯০

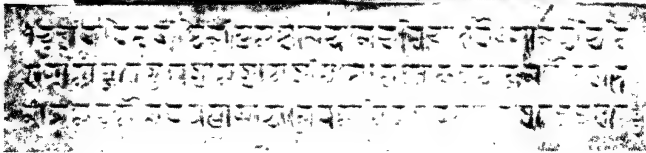
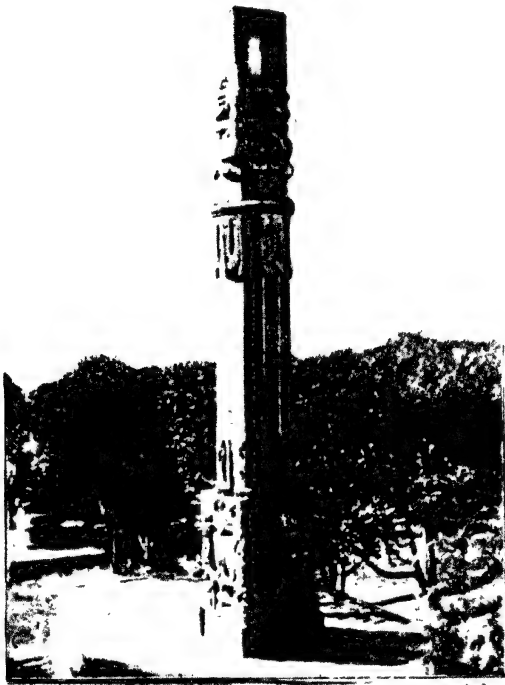


গরুড় স্তম্ভ



কৈবর্তরাজের প্রতিষ্ঠা-স্তম্ভ

দিনাজপুর স্তম্ভ



দিনাজপুর স্তম্ভলিপি

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রমাপ্রসাদ চন্দ্র একটি স্মরণীয় নাম। জনৈক সাধারণ স্কুলশিক্ষক হইতে অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক গবেষকের সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এদেশে এইরূপ কৃতিত্বের দুষ্কান্ত বিরল। বাংলা ১৩১৯ সালে (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার ‘গোড়রাজমালা’ প্রকাশিত হইলে বাঙালী ঐতিহাসিক সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ নিছক শিলালেখ ও তাম্রশাসনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় তিনিই পথ প্রদর্শন করিলেন। আজ কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী পরে গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে গিয়া নবভারত পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষ আমাকে উহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ এই উপলক্ষ্যে স্বর্গীয় ঐতিহাসিকপ্রবরের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধানিবেদনের একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

নিম্নে আমরা সংক্ষেপে রমাপ্রসাদের জীবনী এবং তন্ত্রচিত ‘গোড়রাজমালা’য় উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর পরবর্তীকালে যে নূতন আলোকপাত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(১)

কালীপ্রসাদের পুত্র রমাপ্রসাদ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ঢাকা জিলার জীধরখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার ডাফ কলেজ হইতে তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে কয়েকটি বেসরকারী কলেজে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সেখান হইতে রমাপ্রসাদ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হন। পুরাবৃত্ত এবং নৃতত্ত্বের অনুশীলনে তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কলিকাতার The Dawn পত্রিকার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত রমাপ্রসাদের সর্ব প্রথম প্রবন্ধটির নাম— ‘Some Forgotten Chapters of Early Indian History’। ১৯০৪ ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাইয়ের East and West পত্রিকায় তাঁহার নৃতত্ত্ব ও অস্থাত্ত বিষয় সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের পরামর্শে রমাপ্রসাদ বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় (রাজশাহী, ১৩১৫ সাল) এবং তৃতীয় (ভাগলপুর, ১৩১৬ সাল) অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শরৎচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত রাজশাহী জিলার নানানস্থানে প্রত্নবস্তু সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও উহার প্রদর্শনশালার সূত্রপাত হয়। শরৎকুমার সমিতির প্রেসিডেন্ট, অক্ষয়কুমার ডাইরেক্টর এবং রমাপ্রসাদ অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন। পুরাবস্তু সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সমিতি হইতে কতিপয় যুবাবানু পুস্তকও প্রকাশিত হইল। বাংলাতে রমাপ্রসাদের 'গৌড়রাজমালা' এবং অক্ষয়কুমারের 'গৌড়লেখমালা' ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রমাপ্রসাদের *Indo-Aryan Races* ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ রমাপ্রসাদকে স্কলার হিসাবে গ্রহণ করে। সেই সময় তিনি সাক্ষী জাহ্নবীর পুরাবস্তুর তালিকা (১৯২২) রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার *Dates of the Votive Inscriptions of the Stūpa of Sanchi* এবং *Archæology and Vaishṇava Tradition* সংস্কৃত দুইখানি পুস্তিকাও এই সময়েই রচিত হয়। এগুলি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল (Memoir No. 1, 1919, এবং Memoir No. 5, 1920)।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগ খোলা হইলে তাঁহাকে উহার প্রধান নিয়োগ করা হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে কলিকাতা জাহ্নবীর প্রত্নবস্তু শাখার সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি রচনা করিয়াছিলেন—১। *The Beginnings of Art in Eastern India with special reference to the Sculptures in the Indian Museum* (Memoir No. 30, 1927), ২। *The Indus Valley in the Vedic Period* (Memoir No. 31, 1926), ৩। *Survival of the Prehistoric Civilization of the Indus Valley* (Memoir No. 41, 1929), এবং ৪। *Exploration in Orissa* (Memoir No. 44, 1930)। এই সকল গ্রন্থ রমাপ্রসাদের গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এইসময় তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে এবং অস্থায়

পত্রিকাদিতে অনেকগুলি বহুমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে রাখানগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণরূপে তিনি ‘মূর্তি ও মন্দির’ সংজ্ঞক যে পুস্তিকা রচনা করেন, তাহাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। উহা ‘মানসী ও মর্মবাণী’ (বৈশাখ, ১৩০১ সাল) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

রমাপ্রসাদ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো এবং কয়েক বৎসর উহার কাউন্সিলের নৃতত্ত্ব বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘রায় বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একবার ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের অগ্রতম শাখা-সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ব নৃতত্ত্ব সম্মেলনে যোগদানের জন্ত লণ্ডনে যান এবং *Medieval Indian Sculptures in the British Museum (London, 1936)* সংজ্ঞক গ্রন্থ রচনা করেন। বইখানি ভারতীয় মূর্তিকলার বিদেশীয় ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রমাপ্রসাদ এলাহাবাদে যান এবং অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২৮শে মে তারিখে তাঁহার জীবনান্ত হয়।

(২)

‘গৌড়রাজমালা’ প্রকাশের পর এই সুদীর্ঘকালে বহুসংখ্যক লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি মূল্যবান লেখ প্রস্তরখণ্ড বা শিলামূর্তিতে উৎকীর্ণ; কিন্তু তান্ত্রশাসনের সংখ্যাই অধিক। ঐতিহাসিক মূল্যবস্তান্তেও তান্ত্রশাসনসমূহেরই শ্রেষ্ঠত্ব। এই সকল আবিষ্কারের ফলে অনেক নূতন ঘটনা এবং নূতন রাজা ও রাজবংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন গবেষণার ফলে প্রাচীন মত পরিতাগ করার প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ কয়েকটি বড় বড় বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্তই এই ভূমিকা। ইহা ‘গৌড়রাজমালা’ পাঠকগণের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে কিছুমাত্র সাহায্য করিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

ফরিদপুর জিলায় ধর্মান্দিতা ও গোপচন্দ্রের যে তান্ত্রশাসনগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, পূর্বে কেহ কেহ সেগুলিকে জাল দলিল মনে করিতেন। কিন্তু ধনাইদহ, দামোদরপুর প্রভৃতি স্থানে ঐ ধরণের অনেকগুলি তান্ত্রশাসন

আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ওগুলি জাল নহে।^১ ধর্মানিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচার এবং জয়নাগ শশাকের স্থায় গোড়েশ্বর ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। গোপচন্দ্রের আরও দুইখানি তাম্রশাসন বর্ধমান জিলার মল্লসারুল গ্রামে এবং বালেশ্বর জিলার জয়রামপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।^২ ইহা হইতে গোপচন্দ্রের সাম্রাজ্যের বিশালতার বিষয় জানা যায় এবং বুঝা যায় যে, উড়িষ্যায় গোড় অধিকারের প্রসার শশাকের কিছুকাল পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল।

গোড়রাজগণ কামরূপ ও মৌখরিরাজ্যের শত্রু এবং মালব (পূর্বমালব) রাজ্যের মিত্র ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় মালবরাজ মহাসেনগুপ্ত কামরূপ আক্রমণ করেন এবং কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে পরাজিত করেন।^৩ সুস্থিতবর্মার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গোড়সেনা তেজপুরের যুদ্ধে কামরূপরাজের পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা ও ভাস্করবর্মাকে পরাজিত করে এবং বন্দী করিয়া গোড়ে লইয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। এজন্য অবশ্যই তাঁহাদিগকে তখনকার মত গোড়রাজ্যের বশীভূতমিত্র স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই তথ্য ভাস্করবর্মার নবাবিষ্কৃত ছবি তাম্রশাসন হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গিয়াছে।^৪

শশাক প্রথমে গোড়রাজ্যের সামন্তরূপে শাহাবাদ জিলা শাসন করিতেন। পরে তিনি গোড় সিংহাসনে আরোহণের সুযোগ পান। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' মহাসেনগুপ্তকে 'মালবরাজ' বলা হইয়াছে।^৫ সুতরাং তাঁহাকে 'মহাসামন্ত' শশাকের প্রভু গোড়েশ্বর মনে করা ঠিক নহে। মেদিনীপুরে শশাকের রাজত্বকালীন দুটি নূতন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।^৬

বাণকৃত 'হর্ষচরিত'র মধ্যযুগীয় টীকাকার বলিয়াছেন যে, রাজাবর্ধনের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য শশাক তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহপ্রস্তাব দ্বারা

১। D. C. Sircar, *Select Inscriptions*, Vol. I, 1965. pp. 287ff., 290ff., 332ff., 346ff., 352ff.

২। *Ibid.*, pp. 372ff., 530-31 (cf. *Indian Studies Past and Present*, Vol. VII, pp. 123-26).

৩। *Epigraphia Indica*, Vol. XXX, pp. 295-96; *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III, p. 206.

৪। *Epigraphia Indica*, Vol. XXX, pp. 287ff. (pp. 293ff.):

৫। মহাসেনগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত এবং মাপবগুপ্তকে 'মালবরাজপুত্র' বলা হইয়াছে। পণ্ডিত সম্পাদিত 'হর্ষচরিত', পৃষ্ঠা ১৩৮ ত্রুট্য।

৬। *Journal of the Asiatic Society of Bengal, Letters*, Vol. XI, 1945, pp. 1ff.

স্বাধীনরাজকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গৃহে রাজ্যবর্ধন যখন আহায়ে প্রবৃত্ত, তখন হলে তাঁহাকে অনুচরগণের সহিত হত্যা করিয়াছিলেন।^৭ এই ঘটনার বিবরণে ‘হর্ষচরিতে’ কিছু সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, শশাঙ্ক মিথ্যা ভদ্রব্যবহার দ্বারা রাজ্যবর্ধনের মনে বিশ্বাস জন্মান এবং নিজ ভবনে একাকী শস্ত্রহীন অসন্দ্বিগ্ন শত্রুকে হত্যা করেন।^৮ এই দুইটি বর্ণনায় কোন বিরোধ নাই। শশাঙ্কের স্কন্ধাবারে একস্থানে যদি রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের সহিত আহায়ে বসেন এবং অশুভ্র তাঁহার অনুচরগণ অপেক্ষা করিতে থাকেন কিংবা ভোজনে প্রবৃত্ত হন, এবং সেই অবস্থায় যদি স্বাধীনরাজ এবং তদীয় অনুচরগণকে হত্যা করা হয়, তবে রাজ্যবর্ধন একাকী নিহত হইয়াছিলেন, তাহাও যেমন সত্য, তিনি অনুচরগণের সহিত নিহত হইয়াছিলেন, তাহাও সেইরূপ সত্য।

হর্ষের তাম্রশাসনে রাজ্যবর্ধনের বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তিনি সত্যানুরোধে অর্থাৎ কথা রক্ষার জন্ম শত্রুভবনে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।^৯ ইহার সহিতও পূর্বোক্ত বিবরণের বিরোধ নাই। কারণ সেকালে রাজ্যগণ অনেক সময় বিবাহের জন্ম কণ্ঠকে স্ত্রীয় ভবনে আনাইয়া বিবাহ করিতেন।^{১০} রাজ্যবর্ধন যদি তাহা না করিয়া শশাঙ্কের প্রস্তাবমত তাঁহার স্কন্ধাবারে গিয়া শত্রুকণ্ঠকে বিবাহ করিতে অথবা তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা দ্বারা শত্রুতার অবসান ঘটাইতে স্ত্রীকার করেন এবং তদনুসারে শত্রুভবনে গিয়া পরিণামে নিহত হন, তাহা হইলে কথা রক্ষার জন্মই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

চীন পরিব্রাজক হিউএন-চাঙ বলিয়াছেন যে, পূর্বভারতের রাজা শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধন সম্পর্কে প্রায়ই তাঁহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন, “পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা ধার্মিক হইলে নিজ রাজ্যে অশান্তি ঘটে।” ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণ ঐ রাজ্যকে (রাজ্যবর্ধনকে) এক conference (অর্থাৎ আলাপ-আলোচনার

৭। হর্ষচরিত, পৃষ্ঠা ১৭৫—‘তেন শশাঙ্কেন বিশ্বাসার্থং দৃতমুখেন কণ্ঠাপ্রদানমুক্কা প্রলোভিতো রাজ্যবর্ধনঃ স্বগেহে সানুচরো ভুঞ্জান এব ছন্দনা ব্যাপাদিতঃ।’

৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১০৬—‘গোড়ায়িপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রমেকাঙ্কিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রোষীৎ।’

৯। Epigraphia Indica, Vol. I, p. 72; Vol. IV, p. 210—‘প্রাপানুজ্জ্বলিতবান-রাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ।’

১০। ‘কৌমুদীমহোৎসবে’ কীর্ত্তিমতীর বিবাহ (D. C. Sincar, Studies in the Yugapurāna and Other Texts, pp. 92-93) এবং ভদ্রসাল জাতকবর্ণিত বাসব-খত্তির বিবাহ (Jātakas, Vol. IV, No. 465) প্রভৃতি লক্ষণীয়।

জন্ম) আহ্বান করিয়া আনেন এবং হত্যা করেন।^{১১} এই আলাপ-আলোচনা যদি শশাঙ্কের কন্য়ার সহিত রাজ্যবর্ধনের বিবাহ বিষয়ক হয়, তবে এই বর্ণনার সহিতও পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাগুলির বিরোধ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

পালবংশীয় গোপালের রাজ্যশাসকরূপে নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচন নহে। এই নির্বাচনের স্বরূপ কাঞ্চীর বৈকুণ্ঠপেরুমাল মন্দির লেখে বর্ণিত পল্লববংশীয় নন্দিবর্মার এবং ‘রাজতরঙ্গিনী’ বর্ণিত কাশ্মীররাজ যশঙ্করের নির্বাচনের কাহিনী হইতে বুঝা যায়। পল্লব লেখটিতে মন্ত্রী শুভ্রতি উচ্চরাজকর্মচারী, উচ্চশ্রেণীর প্রজাবর্গ, বণিক শ্রেণী ইত্যাদির উল্লেখ আছে;^{১২} ‘রাজতরঙ্গিনী’তে ব্রাহ্মণদিগকে রাজা নির্বাচন করিতে দেখা যায়।^{১৩}

নূতন লেখাবলী আবিষ্কারের ফলে অধুনা গোপালের রাজ্যকাল ৭৫০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ এবং তৎপুত্র ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করা হয়। ধর্মপাল যে ৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ঐ তারিখে প্রদত্ত রাষ্ট্র-কুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নেসরিকা তাম্রশাসনে তৎকর্তৃক বঙ্গালদেশের অধীশ্বর ধর্মের নিকট হইতে ভগবতী তারার মূর্তিসংবলিত ধ্বজা ছিনাইয়া লইবার দাবি আছে।^{১৪} আবার এখন বালগুদর মূর্তিলেখ হইতে জানা গিয়াছে যে ১১৪৫-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ মদনপালের রাজত্বের প্রথম বৎসর ছিল।^{১৫} পালবংশের লেখাবলীতে রাজগণের যে সকল রাজ্যবর্ধ উল্লিখিত আছে তাহার ভিত্তিতে ধর্মপাল হইতে

১১। Beal's translation, *Buddhist Records of the Western World*, Calcutta reprint, Vol. II, p. 236; also p. 237—"Owing to the fault of his ministers, he (Rājyavardhana) was led to subject his person to the hand of his enemy." See Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Vol. I, p. 34—" [Rājyavardhana], soon after his accession was treacherously murdered by Śaśāṅka, the wicked king of Karna-suvārṇa in Eastern India, a persecutor of Buddhism." See also Beal's *Life of Hiuen-Tsiang by the Shaman Hwui Li*, p. 83—"The king of Karna-suvārṇa in Eastern India, whose name was Śaśāṅkarāja, hating the superior military talents of this king, made a plot and murdered him."

১২। *Epigraphia Indica*, Vol. XVIII, p. 117.

১৩। *ibid.* প্লোক হইতে

১৪। *Epigraphia Indica*, Vol. XXXIV, pp. 125ff., 137ff. গোবিন্দের পিতৃ-প্রব এবং প্রব কর্তৃক পরাজিত গুর্জর-প্রতীহার বংশীয় বৎসরাজ যোগেশ্বরকে দমন করিয়া-ছিলেন, তাহাকে ধর্মপাল বলিয়াই বোধ হয়।

১৫। *Ibid.*, Vol. XXVIII, p. 141.

মদনপালের পনের জন পূর্বপুরুষের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য মোটামুটি নিম্নরূপ জানা যায়।—(১) ধর্মপাল—৩২শ বর্ষ, (২) দেবপাল—৩৫শ বর্ষ, (৩) প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল—৫ম বর্ষ, (৪) নারায়ণপাল—৫৪তম বর্ষ, (৫) রাজ্যপাল—৩২শ বর্ষ, (৬) দ্বিতীয় গোপাল—১৭শ বর্ষ, (৭) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল—অজ্ঞাত, (৮) প্রথম মহীপাল—৪৮তম বর্ষ, (৯) নয়পাল—১৫শ বর্ষ, (১০) তৃতীয় বিগ্রহপাল—২৬শ বর্ষ, (১১) দ্বিতীয় মহীপাল—অজ্ঞাত, (১২) দ্বিতীয় শূরপাল—অজ্ঞাত, (১৩) রামপাল—৫৩তম বর্ষ, (১৪) কুমারপাল—অজ্ঞাত, এবং (১৫) তৃতীয় গোপাল—১৪শ বর্ষ।^{১৩} ইহাতে দেখা যায় যে, উল্লিখিত রাজগণের শাসনকাল মোটামুটি ৩৩১ বৎসরের কম নহে। সুতরাং ইহাতেও দেখিতে পাই ধর্মপালের রাজত্ব ৮১২ খৃষ্টাব্দের পরে আরম্ভ হয় নাই। যেসকল নরপতির রাজ্যবর্ষ জানা গিয়াছে, তাঁহারা উহার পরেও কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারেন এবং যঁহাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই তাঁহারাও অবশ্যই কিছুকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিলে ধর্মপালের রাজ্যকাল ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে নির্ধারিত করা সমীচীন মনে করা যাইতে পারে।

দেবপালের উত্তরাধিকারীকে অনেকে তাঁহার ভাতৃপুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি মির্জাপুর জিলায় প্রাপ্ত প্রথম শূরপালের তৃতীয় রাজ্য্যাকে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি দেবপালের পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার জননী ছিলেন দুর্লভরাজের কন্যা ভবদেবী। শূরপাল মুদগণিরি (মুন্ডের) হইতে শ্রীনগরভুক্তি অর্থাৎ পাটনা অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।^{১৪}

গুর্জর-প্রতীহারবংশীয় নরপতি ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে উল্লিখিত তদীয় পিতামহ দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক কাশ্যকুঞ্জরাজ চক্রায়ুধ এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বঙ্গপতির (অর্থাৎ ধর্মপালের) পরাজয়ের বিষয় ‘গোড়রাজমালা’য়

^{১৩}। R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, pp. 161-62. মজুমদার মহাশয়ের এখানে কিছু ভুল আছে বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল অজ্ঞাত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল অন্ততঃপক্ষে তাঁহার ২৬শ বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে তৃতীয় গোপালের রাজীবপুর মূর্তি-লেখের ১৪শ রাজ্য্যাক পরিভাষ্য হইয়াছে। দেবপালের নালন্দাশাসনের তারিখ অনেকে ৩৯তম বর্ষ পাঠ করিয়াছেন।

^{১৪}। Monthly Bulletin of the Asiatic Society, Vol. VI, No. 10, November, 1971, pp. 4-5.

উদ্ধৃত হইয়াছে। অবশ্য এই প্রশস্তির 'বৃহৎশান্' শব্দটি পূর্বে ভ্রমক্রমে 'বৃহৎশান্' পড়া হইয়াছিল।^{১৮} যাহা হউক, নাগভট চক্রায়ুধকে উৎখাত করিয়া স্বীয় রাজধানী কাশ্যকুঞ্জ স্থানান্তরিত করেন এবং পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পাটনা অঞ্চল অধিকারপূর্বক মুক্তের পরশু অগ্রসর হন। 'প্রভাবকচরিত' সংজ্ঞক জৈন গ্রন্থ অনুসারে কাশ্যকুঞ্জপতি নাগাবলোক (নাগভট) ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগমন করেন।^{১৯} বারাণসীতে প্রাপ্ত ভোজের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, কাশ্যকুঞ্জ জনপদ নাগভটের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কারণ ইহাতে কাশ্যকুঞ্জভুক্তির অন্তর্গত কালঞ্জর মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত উদুম্বর বিষয়স্থিত একটি গ্রামদান সম্পর্কে মৌখরিরাজ শর্ববর্মার দানপত্র এবং তৎসম্পর্কে নাগভটের অনুমোদনের উল্লেখ পাওয়া যায়।^{২০} বারাণসী শাসনটি নাগভটের মৃত্যুর তিন বৎসর মধ্যে মহোদয় অর্থাৎ কাশ্যকুঞ্জ নগর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ তিন বৎসর মধ্যে ভোজের পিতা রামভদ্র যে কাশ্যকুঞ্জে গুর্জর রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া ছিলেন, এ পর্যন্ত কেহ তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। ৮৩৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বাউকের শিলালেখে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার পিতা কল্প মুদগগিরি বা মুক্তের গোড়দিগের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন।^{২১} এই কল্প অবশ্যই নাগভটের সামন্ত ছিলেন। চাহমানবংশীয় রাজা বিগ্রহরাজের হর্ষ শিলালেখে দেখিতে পাই, তাঁহার পূর্বপুরুষ গুবাক নাগাবলোক অর্থাৎ নাগভটের সামন্ত ছিলেন; আবার 'পৃথ্বীরাজবিজয়' সংজ্ঞক গ্রন্থে দেখা যায়, গুবাকের ভগিনীর সহিত কাশ্যকুঞ্জরাজের বিবাহ হইয়াছিল। এই কাশ্যকুঞ্জ-রাজ নাগভট ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।^{২২}

কাশ্যকুঞ্জ অধিকার করিয়া ধর্মপাল কিছুকালের জন্য আর্ধ্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নরপতির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কাশ্যকুঞ্জের শাসকরূপে চক্রায়ুধের রাজ্যাভিষেক সভায় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কৌর জনপদের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।

১৮। Epigraphia Indica, Vol. XVIII, p. 109, verse 21.

১৯। G. C. Choudhury, Political History of Northern India from Jain Sources (c. 650 to 1300 A. D.), p. 25.

২০। Epigraphia Indica, Vol. XIX, pp. 15ff. 'বারা' নামটি প্রকৃতপক্ষে 'বরাহ' হইতে পারে।

২১। Ibid., Vol. XVIII, pp. 87ff.—'যশো মুদগগিরো লক্ণং যেন গোড়ৈঃ সমং যণে।'

২২। R.S. Tripathi, History of Kanauj, pp. 235-36.

ইহা নিশ্চয়ই ধর্মপালের অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। এইজন্যই সোডাটলের 'উদয়সুন্দরীকথা'য় তাঁহাকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলা হইয়াছে।^{২০} এটা অবশ্যই বাঙালীর জ্ঞানার্হ বিষয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, পরিণামে নাগভট ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া পাল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে, তিব্বতরাজ Khri-srong-lde-btsan (৭৫৫-৯৭ খ্রী°) চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত অধিকার বিস্তারে সমর্থ হন। তাঁহার পুত্র Mu-tig-btsan-po (৮০৪—১১ খ্রী°) দাবি করিয়াছেন যে, তিনি জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজা ধর্মপাল ও 'ব্রহ্ম-দপুন'কে বশতা স্বীকারে বাধ্য করাইয়াছিলেন। কেহ কেহ 'ব্রহ্ম-দপুন' হইতে ধর্মপালের জনৈক ভ্রাতৃপুত্র, ভাগিনেয় বা পৌত্র বুঝিয়াছেন।^{২১} যাহা হউক, তিব্বতরাজের দাবিতে কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে ; কিন্তু ধর্মপালের নামোল্লেখের জগ্ন্য ইহাকে সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব। সম্ভবতঃ Mu-tig-btsan-po প্রতীহাররাজের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া উভয়ে একযোগে ধর্মপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

যেরূপেই হউক, ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আনুমানিক ৮১০—৫০ খ্রী°) গুর্জর-প্রতীহারগণের হস্ত হইতে পাটনা অঞ্চল পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। ইহা তাঁহার উল্লেখনীয় কৃতিত্ব। কিন্তু পালবংশের প্রশস্তিমালায় তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে তাঁহাকে যতটা প্রভাবশালী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। দেবপালের সময়ে আর্যাবর্তে গুর্জর-প্রতীহার এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট, পূর্ব-চালুকা, পল্লব প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল। প্রতীহাররাজ ভোজের (আঃ ৮৩৬—৮৫ খ্রী°) বিশাল সাম্রাজ্য সিন্ধুদেশের সীমান্ত হইতে বিহারের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপাল যেমন গুর্জরপতির দর্পচূর্ণ করার দাবি করিয়াছেন, তেমনই ভোজ বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মপাল-তনয় অর্থাৎ দেবপালের রাজলক্ষ্মীকে আঘাৎসাৎ করিয়াছিলেন।^{২২} ভোজ যে কলচুরি কোঙ্কল, রাষ্ট্রকূট স্বিতীয় কুম্ভ এবং চন্দেল হর্ষরাজের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইয়া দেবপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য মনে করা কঠিন। প্রশস্তিতে কোথাও দেবপালকে হিমালয় হইতে সেতুবদ্ধ এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরবসাগর পর্যন্ত সমগ্র চক্রবর্তীক্ষেত্রের

২০। Gaekwad Oriental Series, pp. 4-6.

২১। R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, p. 118.

২২। Epigraphia Indica, Vol. XVIII, p. 113, verse 18.

একমাত্র অধীশ্বর বলা হইয়াছে। কোথাও বা দক্ষিণ প্রান্তে সেতুযজ্ঞস্থলে বিদ্বাপর্বতের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আর্ষাবর্তের ক্ষুদ্রতর চক্রবর্তিক্রমের একচ্ছত্র সম্রাট বলা হইয়াছে।^{২৬} প্রাচীন ভারতীয় সম্রাটগণ সকলেই এইরূপ দাবি করিতেন। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছু নাই।^{২৭} সমসাময়িক তিব্বতরাজ রল্-প-চন্ (আ° ৮১৭—৩৬ খ্রী°) দাবি করিয়াছেন যে, তিনি গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন।^{২৮}

দেবপাল কছোজ জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 'গোড়-রাজমালা'য় এই কছোজদিগকে তিব্বতীয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ 'কছোজ' শব্দ হইতে মোঙ্গোলীয় উপজাতি বিশেষ অর্থে 'কৌচ' বা 'কোচ' নামের উদ্ভব হইয়াছে এবং দেবপালের অর্ধশতাব্দী পরেই বাঙলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে কছোজরাজগণের প্রভুত্ব দেখা যায়।

দিনাজপুর জিলার বাগগড়ে আবিষ্কৃত স্তম্ভলিপিতে জনৈক কছোজায়জ গোড়পতি কর্তৃক একটি শিব মন্দির নির্মাণের উল্লেখ আছে। এই কছোজ বংশীয় রাজার নাম কুঞ্জরঘটাবর্ষ।^{২৯} কেহ কেহ 'কুঞ্জরঘটাবর্ষ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন ৮৮৮ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৬৬ খ্রী°। এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হইলেও লেখক যে দশম শতাব্দীর ত্রাহাতে সন্দেহ নাই।

বালেশ্বর জিলার ইরদা গ্রামে কছোজবংশীয় সম্রাট নয়পাল কর্তৃক রাজধানী প্রিয়ঙ্গু হইতে ত্রয়োদশ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। নয়পাল সুগতভক্ত রাজ্যপালের মহিষী ভাগ্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র এবং বাসুদেবভক্ত নারায়ণপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডুক্রিমগুল অর্থাৎ আধুনিক মেদিনীপুর-বালেশ্বর অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রাম দান করাই শাসনের উদ্দেশ্যে।^{৩০} এই তিনজন কছোজবংশীয় সম্রাট লিপিতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনজন কছোজ নরপতি অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। দিনাজপুর হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। এ সম্পর্কে আরও দুইটি কথা আছে।

প্রথমতঃ, খ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ শাসনে দেখা যায় যে, তাঁহার পিতা

২৬। D. C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, 1971, pp. 11 (note 1) and 14 (note 1).

২৭। Ibid., pp. 1ff.

২৮। R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, p. 118.

২৯। Bhandarkar's List of Inscriptions, No. 1726.

৩০। Epigraphia Indica, Vol. XXII, pp. 150 ff.

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের (আ° ১০৫—১৫ খ্রী°) সেনাদল সমতটদেশের রাজধানী বর্তমান কুমিল্লার নিকটবর্তী দেবপর্বতে উপস্থিত হইয়া সেখানে কস্বোজদিগের অস্তুত কাহিনী শুনিতে পাইয়াছিল।^{৩১} সূত্রাং দশম শতাব্দীর প্রথম দিকেই কস্বোজেরা পূর্ব বাঙলাতেও বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অতএব এ সময়ে বাঙলাদেশে পাল অধিকার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, গুর্জর-প্রতীহারবংশীয় ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল (আ° ৮৮৫—১০৮ খ্রী°) মগধ এবং উত্তর বাঙলা অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত তাঁহার লেখমালার মধ্যে বিহারে প্রাপ্ত প্রথম মূর্তি-লেখটি তদীয় রাজত্বের দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।^{৩২} মহেন্দ্রপালের ৫ম রাজ্যবর্ষের পাহাড়পুর (রাজশাহী) লেখ ^{৩৩} এবং ১৫শ রাজ্যবর্ষের মহী-সন্তোষ (দিনাজপুর) মূর্তি-লেখ ^{৩৪} হইতে জানা যায় যে, নবম-দশম শতাব্দীতে অস্তুতঃ দশ বৎসর কাল উত্তর বাঙলায় প্রতীহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় পালবংশীয় নারায়ণপালের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। পূর্বে বলিয়াছি, প্রতীহাররাজগণ সম্ভবতঃ তিব্বতরাজের সহিত একযোগে পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তাহা হইলে মহেন্দ্রপালের অব্যবহিত পরেই বাঙলাদেশে কস্বোজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে বলিয়া বোধ হয়।

দশম শতাব্দীর শেষদিকে পালবংশীয় মহীপাল (আ° ১১০-১০৫০ খ্রী°) অনধিকারী কস্বোজদিগের দ্বারা অধিকৃত পৈত্রিক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে পরবর্তী জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া শাস্তভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, এরূপ অনুমান সত্য নহে। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ লেখানুসারে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে মহীপাল চোল সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।^{৩৫} আবার তাঁহার সময়েই পাল-কলচুরি দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ‘রামায়ণের’ একখানি পুথি অনুসারে ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে তীরভুক্তি বা উত্তর বিহারে ‘গরুড়ধ্বজ’ গান্ধেশ্বদেবের অধিকার স্বীকৃত

^{৩১}। Ibid., Vol. XXXVII, pp. 289 ; D. C. Sircar, Epigraphical Discoveries in East Pakistan, pp. 19 ff.

^{৩২}। Bhandarkar's List of Inscriptions, Nos. 1641 and 1642.

^{৩৩}। K. N. Dikshit, Excavations at Paharpur (Memoir of the Archaeological Survey of India, No. 55), p. 75.

^{৩৪}। Epigraphia Indica, Vol. XXXVII, pp. 204 ff.

^{৩৫}। Ibid., Vol. IX, p. 233 ; Indian Historical Quarterly, Vol. XIII, pp. 151-52.

হইত।^{৩৩} তিনি অবশ্বই ত্রিপুরীর কলচুরি বংশীয় নরপতি গাঙ্গেয় (আ° ১০১৫-৪১ খ্রী°)। কিন্তু মহীপালের সময়কালীন সারনাথ লেখ হইতে বুঝা যায়, ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তিনি কলচুরিদিগকে বিভাড়ািত করিয়া বারাণসী পর্যন্ত অধিকার বিস্তারে সমর্থ হন।^{৩৪} আবার বৈহাকীর বিবরণ হইতে জানিতে পারি, ১০৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে রাজা গঙ্গ অর্থাৎ কলচুরি গাঙ্গেয়ের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।^{৩৫} সুতরাং ইতিপূর্বেই মহীপাল বারাণসী হইতে বিভাড়ািত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, মহীপালের ভ্রাতা স্থিরপাল ও বসন্তপাল তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বারাণসীতে উপস্থিত ছিলেন; উহা হইতে সেখানে মহীপালের অধিকার প্রমাণিত হয় না।^{৩৬} এই ধারণা সত্য নহে। কারণ সারনাথ লেখে যেসকল মন্দিরাদির নির্মাণ বা সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, সে কার্য সময়সাপেক্ষ এবং গোপনে করা অসম্ভব ছিল। গাঙ্গেয় এবং মহীপালের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক থাকিলে একজনের ভ্রাতৃগণের পক্ষে অস্ত্রের রাজ্যে প্রকাশ্যভাবে কিছুকাল বাস করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না।

বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণ (১০৪১-৭১ খ্রী°) মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজ্যের বিহার অঞ্চল আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বীরভূম জিলার পাইকোড়গ্রামে কর্ণের স্তম্ভলেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে।^{৩৭} সম্প্রতি আবিষ্কৃত বীরভূমের সিয়ান গ্রামের শিলালেখ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, কর্ণ বীরভূম জিলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং এই অঞ্চলেই তিনি পালসেনার হস্তে পরাজিত হন।^{৩৮}

অনেকের ধারণা, সদ্ধাকরনন্দীর 'রামচরিতে' (১৩৮, ২১২৮, ৪৩) বরেন্দ্র ভূমি অর্থাৎ উত্তরবাঙলাকে পালরাজের 'জনকভূ' অর্থাৎ জন্মভূমি বলা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, মহীপাল যে 'পৈত্র্য রাজ্য' উদ্ধার করিয়াছিলেন,

^{৩৩} Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol. XVII, pp. 27 ff.; Vol. XX, pp. 45 ff.

^{৩৪} গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১০৭ হইতে।

^{৩৫} H. C. Ray, Dynastic History of Northern India, Vol. II, p. 773.

^{৩৬} R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, pp. 134-35.

^{৩৭} Archaeological Survey of India, Annual Report, 1921-22, p. 115.

^{৩৮} Journal of Ancient Indian History, Vol. VI, pp. 39 ff. নয়পালের সময়কালীন নবাধিকৃত বাণগড়লেখ হইতে জানা যাইতেছে যে, নয়পাল শৈবধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, প্রথম মহীপালও শৈবশাস্ত্রধর্ম অনুসারী ছিলেন।

তাঁহাও বরেন্দ্র এবং ঐ কথার অর্থ পিতৃভূমি বা জন্মভূমি। এই মত অনুসারে, পালবংশের আদিবাস ছিল বরেন্দ্রে। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। 'জনকভূ' ও 'পৈত্ররাজ্য' কথার প্রকৃত অর্থ পৈত্রিক রাজ্য বা রাজ্যাংশ। বরেন্দ্র পালসাম্রাজ্যের অংশমাত্র ছিল। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, কষোজ-দিগকে পরাজিত করিয়া মহীপাল কেবলমাত্র বরেন্দ্রভূমিই পুনরুদ্ধার করেন নাই। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ বলিয়াছেন যে, পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল 'ভঙ্গল দেশে' অর্থাৎ বঙ্গালদেশে রাজ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।^{৪২} চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজ্যকে চন্দ্রদ্বীপ (অর্থাৎ বাধরগঞ্জ অঞ্চল) অথবা বঙ্গালদেশ বলা হইয়াছে। সেইজন্য মনে হয়, প্রাচীন বঙ্গালদেশ দক্ষিণপূর্ব বাঙলায় অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ ঐ অঞ্চলেই পালবংশের আদিবাস ছিল। আর এইজন্যই বহুজনপদের অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ধর্মপালকে তুচ্ছ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকূটরাজের নেসরিকাশাসনে 'বঙ্গাল-ভূমি' বলা হইয়াছে।^{৪৩}

বঙ্গালসেনকৃত 'দানসাগরের' ভূমিকায় তাঁহার পিতা বিজয়সেন সম্পর্কে বলা হইয়াছে, হেমন্তসেনের পর তিনি বরেন্দ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, সেনরাজগণ প্রথমে উত্তর বাঙলায় রাজত্ব করিতেন। আবার শতাব্দিক বৎসর পূর্বে যখন রাজশাহীর নিকটবর্তী দেওপাড়াতে বিজয়সেনের শিলাপ্রশস্তি আবিষ্কৃত হয়, তখন তিনি বরেন্দ্র হইতে বাঙলার অগ্রাঙ্গ অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, এক্রপ মনে করা অসম্ভব ছিল না। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে লক্ষণসেনের রাজধানী বিজয়পুরের উল্লেখ আছে। এই নগর বিজয়সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারও রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তাই 'গোড়রাজমালা'য় স্থির করা হইয়াছিল যে, ধোয়ীর বিজয়পুর দেওপাড়ার নিকটবর্তী বিজয়নগর। কিন্তু নুতন লেখাদির আবিষ্কারে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় না। অবশ্য 'পবনদূত' কাব্যের বর্ণনা হইতেও দেখা যায়, বিজয়পুর গঙ্গার তীরে ত্রিবেণীর নিকটবর্তী ছিল এবং সেখানে পৌঁছিতে গঙ্গানদী পার হইতে হইত না।^{৪৪} কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিজয়পুর

৪২। R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, pp. 166 ff.

৪৩। Epigraphia Indica, Vol. XXXIV, pp. 125 ff

৪৪। 'গোড়রাজমালা'য় যেমন 'দানসাগর' হইতে—'তদনু বিজয়সেনে: প্রাদুর্ভাসীশ্বরেন্দ্রে' উদ্ধৃত করা হইয়াছে তেমনই 'পবনদূত' হইতে সূক্ষ বা রাঢ়দেশ সম্পর্কিত—'ভাগীরথ্যাপ্তপন-তনয় যত্র নির্ধাতি দেবী' (৩৩শ শ্লোকে ত্রিবেণীর উল্লেখ) এবং 'স্বচ্ছাবারং বিজয়পুরমিত্যুয়তাং রাজধানীম্' (৩৩শ শ্লোক) উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৬০ এবং ৭৪)।

নবদ্বীপের অপর নাম। মুসলমান আক্রমণকালে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপে অবস্থান হইতে মনে হয়, ইহা অসম্ভব নহে। যাহা হউক, সেনবংশের লেখমালায় দেখা যায়, বিজয়ের পূর্বপুরুষগণ কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়া রাঢ়দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।^{৪৫} বীরভূম জিলার পাইকোড় গ্রামে বিজয়সেনের স্তম্ভলিপি আবিষ্কার রাঢ় অঞ্চলে তাঁহার অধিকার প্রমাণিত করে।^{৪৬} বিজয়ের ৬২তম বর্ষে প্রদত্ত ব্যারাকপুর তান্ত্রশাসন আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে, তখন তাঁহার রাজধানী ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর, এবং চক্ৰিণ পরগণা জিলার অন্তর্গত খাড়া অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।^{৪৭} 'অভূত-সাগরের' একটি শ্লোকের ভিত্তিতে 'গোড়রাজমালায়' ১০৮১ শকাব্দ বা ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দকে বিজয়ের পুত্র বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বর্ষ স্থির করা হইয়াছে।^{৪৮} তাহা হইলে বিজয়সেনের অন্ততঃ ৬২ বৎসরব্যাপী রাজ্যকাল ১০৯৭-১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বালগুদর মূর্তি-লেখ হইতে জানা গিয়াছে, পালবংশীয় মদনপাল ১১৫৩-৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন; আবার তাঁহার অষ্টম রাজাবর্ষে প্রদত্ত মনহলি তান্ত্রশাসন দ্বারা রামাবতী নগরী হইতে পুণ্ড্র বর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটবর্ষ বিষয়ে অর্থাৎ উত্তর বাঙলার দিনাজপুর অঞ্চলে ভূমিদান করা হইয়াছিল।^{৪৯} অতএব ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ স্বীয় রাজত্বের ৫৪তম বর্ষের পর মদনপালের হস্ত হইতে বিজয়সেন উত্তর বাঙলা অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি অবশ্যই দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার কোন কোন অঞ্চলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সম্ভ্রতি ভাগলপুর জিলার কহলগাঁওয়ের নিকটবর্তী বিক্রমশীল বিহারের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, চম্পানগরীর অর্থাৎ ভাগলপুরের নরপতির সাহস্র নামক জৈনিক বীর বংশধরকে গোড়েশ্বর সম্মানিত করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে দমন করার জন্ত সোণদামা নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন; কিন্তু

৪৫। N. G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, pp. 44 and 70.

৪৬। *Ibid.*, p. 168.

৪৭। *Ibid.*, pp. 57 ff.

৪৮। পৃষ্ঠা ৬২—'ভূজবসুদনমিতে শকে শ্রীমদ্বল্লালসেনস্য রাজ্যাদে' (*Journal of the Asiatic Society*, 1906, p. 17, note)। প্রকৃতপক্ষে 'ভূজবসুদন' বলিতে ১০৮২ শকাব্দ (১১৬০-৬১ খ্রীঃ) বুঝায়, ১০৮১ শকাব্দ নহে।

৪৯। *Epigraphia Indica*, Vol. XXVIII, p. 141; গোড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১৪৭ হইতে।

সাহস্রের হস্তে বঙ্গাধিপতির নৌবল ও হস্তিসেনা পরাজিত হয়।^{৫০} এই গোড়েশ্বর মদনপাল এবং বঙ্গপতি বিজয়সেন হইবার সম্ভাবনা। কারণ দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিজয় কর্তৃক গঙ্গার প্রবাহপথে পশ্চিমদিকে নৌ-সৈন্য প্রেরণের উল্লেখ দেখা যায়।^{৫১}

বারাণসীর গাহড়বালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মানের তাম্রশাসন দ্বারা পাটনার নিকটে ভূমিদান করেন এবং ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লার তাম্রশাসন মুঙ্গের হইতে প্রদত্ত হয়।^{৫২} এই সময় বিহারে পাল অধিকার সংকুচিত ছিল। কিন্তু মদনপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসর অর্থাৎ ১১৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের একখানি মূর্তি-লেখ হইতে জানা যায় যে, তখন পাটনা জিলায় পাল অধিকার স্বীকৃত হইত।^{৫৩} আবার ভীমদেবের রাজঘাট শিলালেখ হইতে জানিতে পারি, মদনপালের সাক্ষিবিশিষ্ট গাহড়বাল রাজধানীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেখানে একটি শিব মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।^{৫৪} গাহড়বাল যুদ্ধে মদনপাল অবশ্বই বিজয়সেন প্রমুখ সামন্তের সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় উহার পূর্বাংশের উপর তাঁহার মুক্তি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলেই বিজয়সেন বাঙলাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পান।

মদনপালের পর বিহারের পাটন-গয়া অঞ্চলে গোবিন্দপাল (১১৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং মুঙ্গের-ভাগলপুর অঞ্চলে পলপাল (১১৬৫-১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন।^{৫৫} গাহড়বালের পশ্চিম-বিহার হইতে গোবিন্দপালকে উৎখাত করিয়াছিল। গাহড়বাল জয়চন্দ্রের বোধগয়া লেখ ১১৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পরে উৎকীর্ণ হয়। যাহা হউক, পশ্চিম-বিহারের অধিবাসীরা গাহড়বাল অধিকারকালেও দলিলে তারিখ দিতে গোবিন্দচন্দ্রের অতীত রাজ্যের বর্ষাঙ্ক ব্যবহার করিত। গাহড়বাল সৈন্যের অত্যাচার ইহার কারণ হইতে পারে। পলপালের ৩৫শ রাজ্যবর্ষে চম্পা বা ভাগলপুরে একটি মূর্তি

৫০। Journal of Ancient Indian History, Vol. VI, pp. 53 ff.

৫১। N. G. Majumdar, Inscriptions of Bengal, Vol. III, p. 48, verse 22.

৫২। Epigraphia Indica, Vol. XXXVII, p. 245.

৫৩। Bhandarkar's List of Inscriptions, No. 1638.

৫৪। Epigraphia Indica, Vol. XXXII, pp. 277 ff.; Vol. XXXVII, pp. 245-46.

৫৫। Ibid., Vol. XXXV, pp. 235 ff.; Journal of the Bihar Research Society, Vol. XLI, Part 2, pp. 1 ff.

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।^{৫৬} তিনি সম্ভবতঃ সেনরাজের বশীভূত মিত্র ছিলেন। কারণ বল্লালসেনের নবম রাজ্যবর্ষের সনোখার মূর্তি-লেখ হইতে দেখা যায়; ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাগলপুর জিলায় তাঁহার অধিকার স্বীকৃত হইত। বিহারে সেন অধিকার প্রসারের সূত্রে সেন ও গাহড়বালবংশের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। লক্ষ্মণসেন (১১৭৯-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) কাশীরাজ অর্থাৎ গাহড়বাল নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন।^{৫৭} সেনরাজবংশের প্রশস্তিতে বারাগসী এবং প্রয়াগে বিজয়সম্বন্ধ স্থাপনেরও দাবি আছে।^{৫৮} বিহার হইতে সেন অধিকার উৎখাত হইবার পরেও গয়া অঞ্চলের দলিলপত্রে লক্ষ্মণসেনের অতীত রাজ্যের তারিখ দেখা যায়। ইহা হইতেই অধুনা মিথিলাতে প্রচলিত লক্ষ্মণসেনসংবতের উৎপত্তি।^{৫৯}

‘গোড়রাজমালা’ প্রকাশের পর অনেক নূতন রাজা এবং রাজবংশের নাম জানা গিয়াছে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈলেখ হইতে তখন জানা ছিল যে, ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র চোল সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এখন চন্দ্রবংশের বিস্তৃত ইতিহাস জানা গিয়াছে। এই বংশে পূর্ণচন্দ্র, তৎপুত্র সুবর্ণচন্দ্র, তৎপুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র (আনুমানিক ৯০৫-২৫ খ্রীষ্টাব্দ), তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র (আনুমানিক ৯২৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) তৎপুত্র কলাগচন্দ্র (আনুমানিক ৯৭৫-১০০০ খ্রীষ্টাব্দ), তৎপুত্র লডহচন্দ্র (আনুমানিক ১০০০-২০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র (আনুমানিক ১০২০-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন।^{৬০} তাঁহারা শাহাবাদের রোহতাস-গড় হইতে আসিয়া বাখরগঞ্জ অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করেন এবং ক্রমে শ্রীহট্ট পর্যন্ত অধিকার করিয়া বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অগ্ণাঞ্চ রাজগণের মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চলের বৈষ্ণবগুপ্ত (৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সামন্ত

^{৫৬}। Journal of the Bihar Research Society, Vol. XLI, Part 2, pp. 10-11.

^{৫৭}। N. G. Majumdar, Inscriptions of Bengal, Vol. III, pp. 107, 109, 111.

^{৫৮}। Ibid., pp. 121, 128.

^{৫৯}। D. C. Sircar, Indian Epigraphy, pp. 27 ff. লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেশবসেনের নামোক্তে প্রাপ্তমূলক। কারণ ইদিলপুর তাম্রশাসনে ‘সূর্য’ অক্ষর দুইটি ঘষিয়া তুলিয়া অল্পপরিসরে ‘বিষ্ণু’ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাকে ভ্রমক্রমে ‘কেশব’ পড়া হইয়াছে। Epigraphia Indica, Vol. XXXIII, pp. 315 ff. (pp. 319-20) দ্রষ্টব্য।

^{৬০}। D. C. Sircar, Epigraphical Discoveries in East Pakistan, pp. 99 ff.

লোকনাথ (৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখযোগ্য ।^{৩১} কুমিল্লার নিকটবর্তী দেবপর্বতে প্রথমে রাতবংশের জীবধারণ ও শ্রীধারণ (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ)^{৩২} এবং পরে দেববংশীয় বীর, আনন্দ ও ভব (অষ্টম শতাব্দী) রাজত্ব করিয়াছিলেন ।^{৩৩} চট্টগ্রাম তাম্রশাসনের কাণ্ডিদেব নামক নরপতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ।^{৩৪} ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঐ অঞ্চলে যে দেববংশের অভ্যুদয় হয়, উহাতে পুরুবোত্তম, তৎপুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র বাসুদেব, তৎপুত্র দামোদর (১২৩১-৪০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৎপুত্র দশরথ রাজত্ব করেন ।^{৩৫} সেনবংশের পতনের পর দশরথ বিক্রমপুর হইতে শাসন প্রদান করিয়াছিলেন । ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে হরিকালদেব রণবঙ্কমল্ল নামক জনৈক নরপতি ময়নামতী অঞ্চলে অবস্থিত পট্টিকেরা রাজ্য শাসন করিতেন ।^{৩৬} পূর্ববাঙলার বর্মা বংশে বজ্রবর্মা, তৎপুত্র জাতবর্মা, তৎপুত্র হরিবর্মা, তদুজাতা সামলবর্মা এবং তৎপুত্র ভোজবর্মার নাম পাওয়া গিয়াছে । হরির ৩৯শ এবং ভোজের পঞ্চম রাজ্যবর্ষের উল্লেখ আছে । তাঁহারা বিক্রমপুর হইতে শাসন প্রদান করিয়াছিলেন ।^{৩৭} সম্ভবতঃ পাল-বংশীয় রামপালের অনুগ্রহে হরিবর্মা পূর্ব বাঙলায় অধিষ্ঠিত হন । সুপ্রসিদ্ধ ভবদেবভট্ট তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন । বোধ হয় হরির পুত্রকে উৎখাত করিয়া সামল রাজ্য হইয়াছিলেন ।

বাঙলাদেশের কুলশাস্ত্রের ভিত্তিতে অনেকে প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করিতেন । ‘গৌড়রাজমালায়’ ইহার কঠোর সমালোচনা আছে । সেজন্য আমরা রমা প্রসাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী । সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, আদিশুরের কাহিনীটি তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপনের একটি কাহিনীর অনুরূপ এবং সম্ভবতঃ পাল-সেন যুগে বাঙলায় উপনিবিষ্ট দক্ষিণ ভারতীয়েরা উহা এদেশে আমদানী করিয়াছিলেন ।^{৩৮} বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন

৩১। D. C. Sircar, *Select Inscriptions*, Vol. I, 1965, pp. 340 ff. *Epigraphia Indica*, Vol. XV, pp. 301 ff. ; *Indian Historical Quarterly*, Vol. XXIII, p. 224.

৩২। *Indian Historical Quarterly*, Vol. XXIII, pp. 221 ff.

৩৩। *Journal of the Asiatic Society, Letters*, Vol. XVII, pp. 83 ff.

৩৪। *Epigraphia Indica*, Vol. XXVI, pp. 313 ff.

৩৫। *Ibid.*, Vol. XXX, pp. 184 ff. ; ইতিহাস, অষ্টম বর্ষ, পৃষ্ঠা ১৩০ ।

৩৬। *Indian Historical Quarterly*, Vol. IX, pp. 282 ff.

৩৭। N. G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, pp. 14 ff. ; *Epigraphia Indica*, Vol. XXX, pp. 255 ff.

৩৮। D. C. Sircar, *Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India*, Vol. I, pp. 28 ff.

এবং কৌলীন্ত প্রথার উৎপত্তির সহিত উহার প্রকৃত সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। সকালে উত্তর-প্রদেশের জীবন্তি, কোলাঙ্গ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ পূর্বভারতের রাজসভায় এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন। তাঁহাদিগকে বড় বড় ভূখণ্ড ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হইত। শ্রাবস্তিবাসী ব্রাহ্মণেরা বর্তমান হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের নাম পাহনিযোজনের পরিবর্তে শ্রাবস্তি হইয়া যায়।^{৩৯} বাঙলা ও মিথিলার ব্রাহ্মণগণ পশ্চিমাগত ব্রাহ্মণদিগের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। তৃতীয় বিদ্রোহপালের বনগাঁও শাসন হইতে জানা যায়, অনেক সময় স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে বহুপুরুষ পূর্ববর্তী পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশধর বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতেন।^{৪০} এই মনোভাব হইতেই কৌলীন্ত এবং কুলপঞ্জী রচনার প্রথা দুইটির উৎপত্তি। লিখিত বিবরণ ব্যতীত দূরবর্তী কোন পূর্বপুরুষের বংশধরত্ব দাবি করা সহজ ছিল না।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা রমাপ্রসাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সমাপ্ত করিব। বর্তমানে পূর্ব বাঙলার সরকারী নাম 'বাঙলাদেশ'। উহা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেখানকার অধিবাসীদের নাম বাঙালী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম বাঙলা ও উহার অধিবাসিগণের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। কারণ পশ্চিম বাঙলা প্রকৃত পক্ষে বাঙলাদেশের বাহিরে নহে এবং উহার অধিবাসীরাও অবশ্যই বাঙালী। এ স্থলে আমরা বাঙলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চল অর্থে বাঙলাদেশ নামটি ব্যবহার করিয়াছি।

৬৪৫, নিউ আলিপুর,

কলিকাতা—৫৩

১৪১২১১৯৭৩

ত্ৰীদীনেশচন্দ্র সরকার

৩৯। Ibid., pp. 16 ff.

৪০। Ibid., pp. 21 ff.

উপক্রমণিকা

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, “গ্রীষ্মল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে ; মাওরি-জাতির ইতিহাসও আছে ; কিন্তু যে দেশে পৌড়-তীর্থলিপি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।” উপাদানের অভাবকে ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না ; অনুসন্ধান চেষ্টার অভাবই প্রধান অভাব।

ইংরাজ-রাজপুরুষগণ ইহা অনুভব করিবামাত্র, অনুসন্ধান-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শত-বর্ষব্যাপী অনুসন্ধান-চেষ্টায় যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধানের প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই ; উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে বংশাবলম্বনে এ দেশে বাস করিতে গিয়া, নানাবিধ জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাদিগের সহিত দেশের ইতিহাসের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা তথ্যানুসন্ধানের প্রবৃত্ত হইলেই, অনুসন্ধান-চেষ্টা প্রকৃত পথে পরিচালিত হইতে পারে। ইহা এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।

বিগত এক শত বৎসরের অনুসন্ধান-লব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার-কার্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতে পারা যায়, মুসলমান-শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-কালবর্তী বরেন্দ্র-মণ্ডলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসীর ইতিহাসের মূল সূত্রের সন্ধান-লাভের আশা করা যাইতে পারে। বরেন্দ্র-ভূমি প্রাচীন ভূমি বলিয়া,—বরেন্দ্র-ভূমি “দেব-মাতৃক” বলিয়া,—[মহানন্দার পূর্ব-তীর হইতে করতোয়ার পশ্চিম-তীর পর্য্যন্ত] নানাস্থানে এখনও অনেক রাজ-দুর্গের, অনেক রাজভবনের, অনেক দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিশ্বয়-বিজড়িত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ডাক্তার বুকানন্ হামিল্টন্, জেনারেল (স্যর আলেকজান্ডার) কনিংহাম, ওয়েষ্টমেকট, রাভেন্সা, (স্যর উইলিয়ম) হট্টার, অধ্যাপক ব্রুকম্যান প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী বরেন্দ্রভূমির নানাস্থানে তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ই বরেন্দ্র-তথ্যানুসন্ধানের প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু অবসরের অভাবে, কেহই ধারাবাহিকরূপে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান-কার্য পরিচালিত করিতে পারেন নাই।

এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান-সঙ্কলনের আশায়,—বরেন্দ্রমণ্ডলে ধারাবাহিকরূপে তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে

—**শীবাণ্ডিকার হাজরুমার শ্রীমত নরংকুমার রায় বাচস্পতি এম-এ, [১৯১০ খৃষ্টাব্দে)** একটি “বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি” গঠিত করিয়া তথ্যানুসন্ধানে বাণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার অকাতর অর্থব্যয়, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় ইতিহাসানুরাগ, অল্পকালের মধ্যেই, অনুসন্ধান-সমিতিকে সকলের নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

অনুসন্ধান-ক্ষেত্র এবং অনুসন্ধানের অবসর অল্প হইলেও, অনুসন্ধানের ফল নিতান্ত অল্প হয় নাই। প্রথম ফলই প্রধান ফল। দেশের লোকে দেশের ইতিহাসের উপাদান-সঞ্চলনে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ প্রণালীতে অনুসন্ধান-কার্য পরিচালিত করিতে হইবে, প্রথম হইতেই তাহা সমাক্ প্রতিভাত হইয়াছে। আন্তরিক অনুরাগপূর্ণ সহৃদয়তার সঙ্গে, দেশের লোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের সাহায্যলাভ করিতে না পারিলে, অনুসন্ধান-চেষ্টায় সমাক্ সফল-কাম হইবার আশা নাই। ইহা প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, অথচ তাহারাই পুরাকীর্তির প্রকৃত সন্ধানদাতা। সহৃদয়তার অভাব থাকিলে, তাহাদিগের নিকট হইতে সকল বিষয়ের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। সহৃদয়তার অভাব না থাকিলে, তাহারাই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া, নানা বিষয়ের সন্ধান প্রদান করে। অনুসন্ধান-সমিতি এইরূপেই অনেক অজ্ঞাতপূর্বক অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের সন্ধান-লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

অনুসন্ধান-সমিতি এ পর্যন্ত যতদূর অনুসন্ধান-কার্য পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতেই অনেক বিবরণ সঞ্চলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য অনেক স্থান আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, অনেক চিত্র সঞ্চলিত হইয়াছে এবং অনেক পুরাকীর্তির নিদর্শন ও সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য—(১) পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, (২) পুরাতন ভাস্কর্যের নিদর্শন, (৩) পুরাতন জ্ঞান-ধর্ম-সভ্যতার নিদর্শন [অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ]।

অনুসন্ধান-লক্ষ এবং পূর্বাভিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া “গোড়-বিবরণ” নামক [খণ্ডশঃ প্রকাশিতব্য] গ্রন্থ সংকলন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবামাত্র, অনুসন্ধান-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে আলোচিত হইবে বলিয়া, “গোড়-বিবরণ” আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহা যথাক্রমে—রাজমালা, শিল্পকলা, বিবরণমালা, লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ত্ব, শ্রীমুক্তিতত্ত্ব ও উপাসক-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইবে।

গোড়-বিবরণের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড [অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ প্রণীত] “গৌড়রাজমালা” প্রকাশিত হইল। তাহার সম্পাদন-ভার আমার উপর হস্ত করিয়া, অনুসন্ধান-সমিতি আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে নিরতিশয় স্নানার্থ্য বিষয় হইলেও, এই ভার যোগ্যতর হস্তে হস্ত করিতে পারিলেই ভাল হইত।

॥ ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি ॥

মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, গৌড়মণ্ডলে সেনবংশীয় নরপাল-গণের বিজয়-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎপূর্বে পালবংশীয় নরপালগণ এ দেশের শাসন-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এ কথা ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালীর নিকটও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। ইহার সঙ্গে জনশ্রুতি অনেক অলৌকিক কাহিনী জড়িত করিয়া দিয়াছে ; কল্পনালোলুপ লেখকবৃন্দ তাহাকে অনেক রচনা-মাধুর্যে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু কোন সময় হইতে কিরূপ ঘটনাচক্রে, পাল-নরপালগণের অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল ;—কোন সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে তাঁহাদিগের রাজ্য সেন-বংশীয় নরপালগণের করতলগত হইয়া, আবার কালক্রমে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল ;—তাহার সঠিত দেশের লোকের কতদূর পর্য্যন্ত কিরূপ সম্পর্ক বর্তমান ছিল ;—তাহা নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য কথা [উপযুক্ত আলোচনা-প্রণালীর অভাবে] জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায়, অনুসন্ধান-লব্ধ যৎসামান্য বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা স্মরণ করিয়াই, “গৌড়রাজমালা” অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন ‘লেখমালা’,—তাহাতে পুরাতন তাম্রশাসনের এবং শিলালিপির পাঠ, বঙ্গানুবাদ এবং টীকা সম্মিষ্ট হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য অবলম্বন, ভারতবর্ষের অস্থায় প্রদেশে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের এবং শিলালিপির পাঠ, পুরাতন পুস্তক-নিহিত ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পূর্বাচার্যগণের ঐতিহাসিক গবেষণা। তাহা গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না, পাঠক-সমাজ তাহার বিচার করিবেন।

ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলিত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না—তাহা বহুবায়সাধ্য, বহুশ্রমসাধ্য ; এ সকল কথা বঙ্গসাহিত্যে পুনঃ পুনঃ

উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকেই একমাত্র অনুরায় বলিয়া নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। কিরূপ বিচার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। স্থায়নিষ্ঠ বিচারপতির স্থায় নিয়ত সত্যোদঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কবি কল্লণ ‘রাজতরঙ্গিণীর’ উপোদ্ঘাতে লিখিয়া গিয়াছেন,—

শ্লাঘাঃ স এব গুণবান্ রাগদেহ-বহিষ্কৃতা।

ভূতার্থ-কথনে যস্য স্বেয়স্বেব সরস্বতী ॥

আমাদের সাহিত্যে এই উপদেশ-বাক্য এখনও সমাক্ষ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ, আমাদের পূর্বে হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। পালবংশের এবং সেনবংশের নরপালগণের শাসন-সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা যেন তুচ্ছ কথা—ঐতিহাসিকের জাতি কি ছিল, তাহাই এখনও আমাদের নিকট প্রধান আলোচ্য হইয়া রহিয়াছে! জনশ্রুতির দোহাই দিয়া, [এক শ্রেণীর গ্রন্থে] দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে যে সকল আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী মর্যাদা লাভ করিতেছে না। এই সকল কারণে, গোড়রাজমালার লেখক মহাশয় ভিত্তিহীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, বাঙ্গালীর জনশ্রুতি-মূলক ইতিহাসের প্রধান পাত্র [আদিশূর] ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও তান্ত্রশাসনে বা শিলা-লিপিতে বা সমকালবর্তী গ্রন্থে আদিশূরের অসন্দ্বিগ্ন পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। সমসাময়িক গ্রন্থে বা লিপিতে উল্লিখিত ঐতিহাসিক পাত্রগণের প্রকৃত বিবরণ সঙ্কলনেও কিরূপ সতর্ক দৃষ্টিতে বিচার-কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সুযোগ্য লেখক মহাশয় “গোড়াধিপ-শশাস্ত্রের” প্রসঙ্গে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্চাশতের, “গোড়রাজমালায়” দেখিতে পাওয়া যাইবে, পাল-নরপাল-গণের অভ্যুদয়-লাভের অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল; সমগ্র দেশের উপর কাহারও কোন রূপ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল না; বাহুবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সবলের কবলে দুর্বলদল নিপীড়িত হইতেছিল; দেশ একেবারে ‘অরাজক’ হইয়া পড়িয়াছিল! সংস্কৃত-সাহিত্যে একরূপ অবস্থার নাম “মাৎস্য-স্থায়”। তাহাকে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে,

প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। তিনিই পাল-নরপাল-বংশের প্রথম ভূপাল,—ইতিহাসে “প্রথম গোপালদেব” নামে উল্লিখিত।

॥ বাঙ্গালীর ইতিহাসের গৌরব যুগ ॥

এ দেশের প্রজাপুঞ্জ, অরাজকতা দূর করিবার জন্ম একবার একজনকে রাজা নির্বাচিত করিয়া, প্রজাশক্তির বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,—ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ সময়ে, প্রজাশক্তির এরূপ উন্মেষ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার আলোচনার সময়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য।

বাঙ্গালী ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! লামা তারানাথের [তিব্বতীয় ভাষা-নিবন্ধ] গ্রন্থে এতদ্বিষয়ক জনশ্রুতির উল্লেখ থাকিলেও এবং বঙ্গদেশে এই জনশ্রুতির আভাস লৌকিক উপকথায় গ্রথিত রহিলেও, তাহাকে কেহ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেবের [মালদহের অন্তর্গত খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকায়, এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এইরূপে, [প্রজাশক্তির সাহায্যে] যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র উত্তরাপথে [আর্ঘ্যাবর্তে] প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহার কথা এখনও বঙ্গসাহিত্যে যথায়োঁগ্য ভাবে আলোচিত হয় নাই। এই গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কথাই “গৌড়রাজমালার” প্রধান কথা। গৌড়-বিবরণের অত্যন্ত ভাগে [শিল্ককলায়, বিবরণমালায়, লেখমালায়, গ্রন্থমালায়, জাতিতত্ত্বে, শ্রীযুক্তিতত্ত্বে এবং উপাসক-সম্প্রদায়ে] যাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও প্রধান কথা,—এই গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কথা। কারণ ইহার সকল কথাই বাঙ্গালীর কথা।

একটি কারণে, এ সকল কথা বাঙ্গালীর নিকট যথায়োঁগ্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পাল-নরপালগণের জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাঁহারা কিরূপে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা মগধবাসী, মগধের অধিপতি ছিলেন; এবং ক্রমে বঙ্গভূমিতে রাজ্য বিস্তৃত করিয়া “গৌড়ে-শ্বর” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন;—বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের পদানত হইয়াই বাস করিত। ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনে পাটলিপুত্রে, দেবপালদেবের তাম্রশাসনে মুঙ্গেরিতে [মুঙ্গেরে] এবং নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনেও

মুগ্ধগিরিতে “জয়স্কন্ধাবার” সংস্থাপিত থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, [অনেকের শ্রায়] আমি নিজেও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, পঞ্চ-পাল-নরপাল বঙ্গভূমিতে বাস করিতেন না। বরেন্দ্রমণ্ডলে অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত হইবামাত্র, সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বরেন্দ্রমণ্ডলে সংস্থাপিত গরুড়-স্তম্ভের দ্বিতীয় শ্লোকে, ধর্ম [পাল] প্রথমে পূর্বদিকের অধিপতি থাকিয়া পরে [মন্ত্রীবর গর্গের মন্ত্রণা-কৌশলে] “অখিল দিকের” অধিপতি হইবার উল্লেখ আছে। তারানাথের গ্রন্থেও, প্রথমে গৌড়, পরে মগধ, বিজিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। “রামচরিত”-কাব্যে বরেন্দ্রভূমিই পাল-নর-পালগণের “জনকভূমি” বালয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং, পাল-নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে আর সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই।

পাল-নরপালগণ যদি বাঙ্গালী হইবেন, তবে তাঁহাদিগের রাজধানী কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল? বাঙ্গালা দেশের কোন্ নিভৃত নিদেশে তাহারা নির্বাচিত বাঙ্গালী নরপাল [গোপালদেব] রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া-ছিলেন? কোন্ ভূমিখণ্ডে বাঙ্গালা প্রজাপুঞ্জের হৃদয় এরূপ অচিহ্নিতপূর্ব প্রজাশক্তি-বিকাশের প্রশংসনীয় গৌরবে স্ফাট ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল? কেহ কেহ [গৃহে বসিয়াই] ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া, মীমাংসা-সাধনের অঙ্গ উপায় না দেখিয়া অনুদান-বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—পাল-নরপালগণের রাজধানী এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তাঁহারা জয়স্কন্ধাবারেই বাস করিতে ভালবাসিতেন; যেখানে যখন জয়স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইত, সেখানেই একটি তৎকালোচিত রাজনগর গঠিত হইয়া উঠিত।

রাজার পক্ষে এরূপ “যাযাবর-বৃত্তি” কখন কখন আনন্দপ্রদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, রাজ্যের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। যে রাজবংশ আর্য্যাবর্তব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্যের অধাশ্বর হইয়াছিল, কোনও স্থানেই তাহার স্থায়ী রাজধানী বর্তমান ছিল না,—এরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহসী না হইয়া, অনুসন্ধান-সমিতি, বরেন্দ্র-মণ্ডলে অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত হইয়া, বিবিধ রাজনগরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। “বিবরণ-মালায়” তাহার বিবরণ এবং প্রমাণাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পাল-রাজবংশের দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, নবম, একাদশ, এবং সপ্তদশ নরপালের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন লিপির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, প্রথম নরপালের সময়ে, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত;—দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নরপালের সময়ে তাহার প্রকৃত অভ্যুদয়;—

চতুর্থ এবং পঞ্চম নরপালের সময় পর্য্যন্ত গোড়মুগ্ধে পাল-নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বর্ধমান। এই অভ্যুদয়-যুগ বাঙ্গালীর ইতিহাসের গৌরব-যুগ। এই যুগে, বরেন্দ্রমুগ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়া [ধর্মপালদেবের এবং দেবপালদেবের শাসন-সময়ে] ধীমান্ এবং তৎপুত্র বীতপাল গৌড়ীয় শিল্পে যে অনিন্দ্য-সুন্দর রচনা-প্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ “শিল্প-কলায়” সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার সন্ধান-লাভে অসমর্থ হইয়া, লেখকগণ এই যুগের মগধের এবং উৎকলের শিল্প-নিদর্শনকে মগধের এবং উৎকলের প্রাদেশিক শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন বলিয়াই বাখ্যা করিয়া আসিতেছেন।

ইহার পরবর্তী যুগের [ষষ্ঠীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর] বাঙ্গালীর ইতিহাসও তমসাক্ষর হইয়া রহিয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতি এই যুগের যে সকল বিবরণ সংকলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদনুসারে এই দুই শত বৎসরের মধ্যে পাঁচ বার ভাগা-বিবর্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রথম ভাগে, একটি প্রবল বিপ্লবের অবসানে পাল-সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাব। তাহার নায়ক প্রথম মহীপালদেব এবং ফলভোগী তদায় পুত্র নয়পাল এবং পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। তাঁহাদিগের কথাই একাদশ শতাব্দীর প্রধান-কথা।

দ্বিতীয় ভাগে, একটি অচিকিত্তপূর্ব্ব আকস্মিক প্রজা-বিদ্রোহ, রাজহত্যা এবং বিয়ংকালের জগ্গ এক কৈবর্ত-রাজবংশের অভ্যুদয় ও তিরোভাব। তৎকালের প্রধান পাত্রগণের নাম [অনীতিকারভ-রত] দ্বিতীয় মহীপালদেব, তাঁহার নিধনকারী [প্রজা-বিদ্রোহের নায়ক] কৈবর্তপতি দিব্বোক, তদীয় ভ্রাতা রুদোক এবং রুদোকের পুত্র ভাম রাজা।

তৃতীয় ভাগে, কৈবর্ত-বিদ্রোহের অবসানে, পাল-রাজ্যগণের জনক-ভূমির [বরেন্দ্রের] উদ্ধারসাধনের পর, পাল-সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় এবং অধঃপতন। এই সময়ের নরপালগণের নাম— শুরপাল, রামপাল, রামপালের পুত্র কুমারপাল, পৌত্র তৃতীয় গোপাল এবং কুমারপালের ভ্রাতা মদনপাল।

চতুর্থ ভাগে, সেন-রাজবংশের অভ্যুদয় এবং রাজ্য-বিস্তার; তাহার নায়ক— বিজয়সেন, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, এবং পৌত্র লক্ষ্মণসেন।

পঞ্চম ভাগ শেষভাগ,—তাহাতে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান-অধিকার প্রচলিত হইবার সূত্রপাত।

এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত [ষষ্ঠীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর] বাঙ্গালীর ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাবলী দেশের লোকে বিস্মৃত হইয়া গেলেও, বরেন্দ্র-মুগ্ধে তাহার নানা স্মৃতিচিহ্ন বর্ধমান আছে। সেই সকল স্মৃতিচিহ্ন ধরিয়া

অনুসন্ধান-কার্যে প্রবৃত্ত না হইলে, এই দুই শত বৎসরের ইতিহাসের প্রকৃত মৰ্ম্ম
হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

॥ কাছোজায়জ গৌড়পতি ॥

প্রথম ভাগে যে বিশুল বিপ্লবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শতাধিক বৎসর
পূর্বে [১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী
গ্রামে] আবিষ্কৃত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে তাহা
সূচিত থাকিতেও অক্ষর-বিলোপের অত্যাচারে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার
সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারে নাই। এই শ্লোকটি নবম নরপাল মহীপাল
দেবের [বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্র-
শাসনেও উৎকর্ণ থাকায়, উত্তরকালে ইহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছিল। যথা,

“হত-সকলবিপত্তঃ সঙ্গরে বাহু-দর্পাং
অনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যামাসাদ্য পিত্রাম্ ॥
নিহিত-চরণপদ্মো ভূভূতাং মুর্ধ্বিণ তন্মাং
অভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥”

ইহাতে জানিতে পারা গিয়াছিল,—মহীপালদেবের পিতৃরাজ্য ‘অনধিকারী’
কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি তাহা পুনরায় বাহুবলে লাভ করিয়া-
ছিলেন। কিন্তু সেই অনধিকারী কে—তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল।

সেই অনধিকারীর নাম এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি
৮৮৮ শকাব্দায় [১৬৬ খৃষ্টাব্দে] বরেন্দ্রমণ্ডলে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া
আপনাকে “কাছোজায়জ গৌড়পতি” বলিয়া প্রস্তরস্তম্ভে যে শ্লোক উৎকর্ণ
করাইয়াছিলেন, সেই শ্লোক-সংযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভটি অদ্যাপি বরেন্দ্রমণ্ডলেই
[দিনাজপুরাধিপতির উদ্যান মধ্যে] বর্তমান আছে। তাহার সহিত বাঙ্গালীর
ইতিহাসের সম্বন্ধ কি, “গৌড়রাজমালায়” তাহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালীর ইতিহাসে—পালরাজবংশের অধিকারকালে
কাছোজায়জ [আগলুক] গৌড়পতির সন্ধান-লাভের পর, অনুসন্ধান-
সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সেই নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সমাচার একটি
ইংরাজী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা [স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত স্যর
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের কৃপায়] এসিয়াটিক সোসাইটির
পত্রিকায় এবং [একটি বাঙলা প্রবন্ধে] ‘সাহিত্য’ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগে যে প্রজা-বিদ্রোহ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাল-রাজবংশের
পঞ্চদশ নরপাল কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী [কামরূপাধিপতি] বৈদ্যদেবের

[কমৌলীতে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে স্মৃতি হইয়াছিল। ভীমকে নিহত করিবার পর বরেন্দ্রীর [জনকভূর] পুনরুদ্ধার-সাধনের কথা এই শ্লোকে রামপালদেবের প্রধান কীর্তি-কথা বলিয়া উল্লিখিত থাকিতেও অধ্যাপক ভিনিস্, তাহার ব্যাখ্যাকালে, “জনকভূমিকে” মিথিলা বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি তমসাজ্জম হইয়া পড়িয়াছিল। বরেন্দ্রমণ্ডলে এখনও এই প্রজা-বিদ্রোহের নানা স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান আছে। তাহার বিলুপ্ত বিবরণ “বিবরণমালায়” সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এক সময়ে এই প্রজা-বিদ্রোহের কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুপরিচিত ছিল। শতবর্ষ পূর্বেও বুকানন্ হামিলটন্ তদ্বিষয়ক জনশ্রুতির সন্ধানলাভ করিয়াছিলেন। সমকালবর্তী বরেন্দ্র-নিবাসী রাজকবি সঙ্ঘাকর-নন্দী, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ‘রামচরিত’ নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে, তাহা নেপাল হইতে আনীত হইয়া [এসিয়াটিক্ সোসাইটীর যত্নে] মুদ্রিত হইয়াছে। “গোড়রাজমালায়” এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের আন্দোলনের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজাপুঞ্জের নির্বাচনক্রমে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, প্রজাশক্তির সাহায্যে সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে রাজবংশের প্রবল পরাক্রমশালী নরপাল দেবপালদেবও, তদীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন কবিতেন বলিয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় মহীপালদেব [অনীতি-পরায়ণ হইয়াই] প্রজা-বিদ্রোহ প্রধুমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; এবং তাহাতে স্বয়ং ভস্মীভূত হইয়া, বরেন্দ্রমণ্ডল হইতে পাল-রাজবংশের শাসন-ক্ষমতা ও কিয়ৎকালের জন্ম ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রমণ্ডলে পুনরায় অধিকার লাভ করিতে, রামপালদেবকে বিপুল সমর-সজ্জার আয়োজন করিতে হইয়াছিল; বহু যুদ্ধে তিল তিল করিয়া বরেন্দ্রভূমিতে বিজয়-লাভ করিতে হইয়াছিল। ইহাতেই তৎকালের লোকনায়কগণের প্রবল শক্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। বরেন্দ্রমণ্ডলের এই ক্ষণস্থায়ী প্রজা-বিদ্রোহের একটি চিরস্থায়ী কীর্তি-স্তম্ভ এখনও সম্মুখ শিরে সর্গোরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার কথা বাঙ্গালীর ইতিহাসে স্থানলাভ করিতে পারে নাই; বরেন্দ্রমণ্ডলের সহিত পরিচয়ের অভাবে, রামচরিত-কাব্য মুদ্রিত করিবার সময়ে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেও তাহা প্রতিভাত হইতে পারে নাই।

ভীমের নাম এখনও জনশ্রুতি হইতে বিদ্যুৎ হয় নাই। তিনি রামপাল-

দেবের আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিবার আশায়, বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তভাগের নানাস্থানে, যে সকল মৃৎপ্রাকার রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও “ভীমের ডাইক” এবং “ভীমের জাঙ্গাল” নামে কথিত হইতেছে। কিন্তু কল্পনা-লোলুপ জনসাধারণ তাহাকে মধ্যম পাণ্ডবের কীর্তিচিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করিতেছে; কোন কোন আধুনিক ইতিহাস-লেখক তাহাকেই বরেন্দ্রভূমির অতি-প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলিয়া ইতিহাস রচনা করিতেছেন!

॥ রামাবতী ॥

তৃতীয় ভাগের প্রধান কথা “রামাবতী”র কথা। প্রজা-বিদ্রোহের অবসানে, রামপালদেব এক নূতন নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাই পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী—“রামাবতী”। সন্ধ্যাকর নন্দী “রামচরিত” কাব্যে এই নগর-নির্মাণেরও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা বরেন্দ্র-ভূমির শোভাযর্জন করিয়াছিল। যে ভূমি “অপ্ননর্ভবা” নামক মহাতীর্থে সুপবিত্র এবং “জাগদল-মহাবিহারে” সুশোভিত, সেই বরেন্দ্র-ভূমিতেই “রামাবতী” নিশ্চিত হইয়াছিল। পণ্ডিতবর শাস্ত্রী মহাশয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাকে পূর্ববঙ্গের “রামপাল” বলিয়া [রামচরিত কাব্যের ভূমিকায়] পার্শ্ব-দীক্ষায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। অনুসন্ধান-সমিতি রামাবতীর, জাগদল-মহাবিহারের এবং অপ্ননর্ভবা তীর্থের অনুসন্ধান করিয়া নানা ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। রামাবতীর নাম এখন বাঙ্গালীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও অনেক দিন পর্যাস্ত সুপরিচিত ছিল। “সেখ শুভোদয়া” নামক [মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুর মসজিদে প্রাপ্ত] হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে “রামাবতীর” প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। তখন তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক-বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত পালরাজবংশের সপ্তদশ নরপাল মদনপালদেবের তাম্রশাসনে “রামাবতী-পরিসরে” জয়স্বক্কাবার প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উল্লেখ দেখিয়া, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীমুগ্ধ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় [বরেন্দ্রমণ্ডলে পদার্পণ না করিয়াও] তাহাকে দিনাজপুরের অন্তর্গত একটি স্থানের সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু তাহা প্রথম চেষ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

রামপাল প্রজা-বিদ্রোহের প্রকোপে জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইবার পর, নানা ক্রমশে জন্মভূমির উদ্ধার সাধন করিয়া, যেরূপ অধাবসায়ের এবং কষ্ট-

সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া রাজকবি তাঁহাকে দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বাহুবলে এবং মন্ত্রণা-কৌশলে রামপাল বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তিনি রামপালের মাতুল এবং চির-সুহৃৎ অঙ্গাধিপতি মহনদেব। “সেখ শুভোদয়ঃ” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—

“শাকে যুগ্মবেণুরঙ্গগতে (?) কন্যাং গতে ভাস্করে

কৃষ্ণে বাক্পতি-বাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।

জাতুব্যাং জলমধ্যত স্তনশনৈ ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো

হা পালানয়-মৌলি-মণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ ॥”

রামপাল ভাগীরথী-গর্ভে অনশনে তনুতাগ করিয়াছিলেন। একরূপ আত্ম-বিসর্জনের কারণ কি, “সেখ শুভোদয়ঃ”-গ্রন্থে তাহার পরিচয়-লাভের উপায় ছিল না। রামচরিত কাব্যে সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ;—মহনদেবের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই শোকাক্ত রামপালদেব আত্ম-বিসর্জন করিয়া-ছিলেন। তাহার পর, কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলে [বরেন্দ্র-মণ্ডলে আরও কিয়ৎকাল পাল-রাজবংশের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিলেও] “অনুত্তর-বন্দে” এবং কামরূপে বিদ্রোহ-বিকার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী বৈদ্যদেবের বাহুবলে তাহা দূরীভূত হইলেও, পালসাম্রাজ্য আর পূর্ব প্রতাপে সঞ্জীবিত হইতে পারে নাই। কুমারপালের মৃত্যুর পরে, তদীয় শিশুপুত্র তৃতীয় গোপাল এবং [তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর] কুমারপালের ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই শেষ। তাহার পর আর বরেন্দ্রমণ্ডলে পাল-নরপালগণের প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই।

চতুর্থ ভাগে সেন-রাজবংশের অভ্যুদয়। তাহা এই সকল কারণেই, সফল হইবার অবসর লাভ করিয়াছিল। সেন-রাজবংশ বাঙ্গালার শেষ হিন্দু-রাজবংশ হইলেও, কিরূপে সে রাজবংশ এ দেশে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও তমসচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার সাধন করিবার উপযোগী অধিক প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নানা কল্পনা-জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন-কাহিনীর শ্রায় ইহার অভ্যুদয়-কাহিনীও প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি [কাটোয়ার নিকটবর্তী স্থানে] এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বল্লালসেনদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেন-রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেনদেবের [রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রছায়েশ্বর-মন্দিরলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

“বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলা-সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীক্ষৈ কীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীন্তিমস্তির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয়শ্চয়ঃ সৃজি-মাধ্বীকথারাঃ
পারার্শর্যেণ বিশ্ব-শ্রবণপরিসর-প্রীগনায় প্রণীতাঃ ॥”

[পারার্শর্য্য] ব্যাসদেব যাঁহাদিগের চরিত্র-বর্ণনায় বিশ্বনিবাসিগণকে প্রীতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্য-ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেনরাজগণ জন্মগ্রহণ করিবার এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও, [মহাভারতোক্তে নলরাজ্যের পিতা বীরসেনের কথা চিন্তা না করিয়া] কেহ কেহ বীরসেনকে আদিশুর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বীরসেন-বংশধর বিজয়সেনদেবের পিতামহ সামন্তসেন যোদ্ধাপুরুষ ছিলেন।

“দুর্ব্বস্তানা ময়মরিকুলাকীর্ণ-কর্ণটলক্ষ্মী-
লুষ্ঠাকানাং কদন মতনোস্তাট্টগেকান্দ্রবীরঃ।
যস্যাদন্যাপাবিহত-বসামাংসমেদঃ-সুভিক্ষাং
দৃষ্ণৎ পৌর স্তজতি নু দিশাং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥”

তিনি “কর্ণটলক্ষ্মী-লুষ্ঠনকারী-দুর্ব্বস্তগণের কদন” বিধান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি গঙ্গাপুলিন-পরিসরের পুণ্যা-শ্রমনিচয়েই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনদেবের [মাধাইনগরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, সেনরাজগণ কর্ণটক্ষত্রিয়-বংশে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনদেবের [কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজ্যালাভের পূর্বে, বিজয়সেনের পিতৃ-পিতামহ রাঢ়দেশকে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় এই সকল প্রমাণের অবতারণা করিয়া, প্রাচীন লিপির “কর্ণট”-রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্ম [বিহ্বলদেবের বিক্রমাক্ষ-চরিতের এবং কল্লণের রাজতরঙ্গিণীর উপর নির্ভর করিয়া] কল্যাণের চালুক্য-রাজগণের রাজ্যকেই “কর্ণট” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। “কর্ণাটেন্দ্রু” বিক্রমাদিত্য কর্ত্তক [১০৪০-১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে] গোড়-কামরূপ পরাভূত হইবার একাট কাহিনী “বিক্রমাক্ষদেবচরিতে” উল্লিখিত আছে।

॥ বিজয়োৎসব ॥

ইহাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইহাকেই কর্ণাট-রাজ্যের সহিত গোড়-রাজ্যের প্রথম সংঘর্ষ বলিয়া স্বীকার না করিয়া, ইহার পূর্বেও, [গোড়াধিপ প্রথম মহীপালদেবের শাসন-সময়ে] আর একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সে সংঘর্ষে গোড়াধিপ মহীপালদেব বিজয়লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার বিজয়োৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্ম “চণ্ডকৌশিক” নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। তাহার “প্রস্তাবনায়” দেখিতে পাওয়া যায়,—

“অলমতি বিস্তরেণ। আদির্ছোহস্মি দুষ্ঠামাতা-বুদ্ধিবাত্তরাহলজ্যা-সিংহরং-
হসা জ্জডলীলা। সমুহতাশেষ-কণ্টকেন সমর-সাগরান্তর্জ-মভুজদণ্ড-মন্দরাকৃষ্ট
লক্ষ্মী-স্বয়ংবর প্রণয়িনা শ্রীমহীপালদেবেন। যস্যেমাং পুরাবিদঃ প্রশস্তিগাথা-
মুদাহরন্তি—

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্য্যাচাণকা-নীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটক্ং ধ্রুবমুপগতানন্ড তানেব হন্তং
দৌর্দপাঠাঃ স পুনরভবং শ্রীমহীপালদেবঃ ॥”

নান্দীপাঠ সমাপ্ত হইবার পরেই সূত্রধার বলিতেছেন—থাক থাক, আর [পূর্বরঙ্গের] আত-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। আমরা শ্রীমহীপালদেব-কর্তৃক নাট্যাভিনয়ার্থ আদিষ্ট হইয়াছি। তিনি দুষ্ঠামাতাবর্গের বুদ্ধিজালে আবদ্ধ হইবার অযোগ্য অলংখ্য সিংহ-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া, জ্জডলীলায় অশেষ ক্ষুদ্র কণ্টক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সমর-সাগর হইতে তদীয় মন্দররূপী ডুঙ্গ-দণ্ডের আকর্ষণ-বলে বিজয়-লক্ষ্মী উথিত হইয়া তাঁহাকে স্বয়ংবর-প্রণয়ী করিয়াছে। পুরাবিদগণ তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রশস্তি-গাথা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

“যে চন্দ্রগুপ্ত স্বভাব-দুর্বেশ আৰ্য্যাচাণকা-নীতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, নন্দ-রাজগণকে পরাভূত ও কুসুমপুর অধিকৃত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি নন্দগণ কর্ণাটক-লাভ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়, তাঁহাদিগের নিধন সাধনের জন্ম সেই চন্দ্র-গুপ্ত আবার শ্রীমহীপালদেবরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।”

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, [রামচরিতের ভূমিকায়] ইহাকে মহীপাল কর্তৃক রাজেন্দ্র চোড়ের পরাভব-কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, কর্ণাট-রাজ্যকে চোল-রাজ্যের একাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, তাহাকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া

সেনরাজ-বংশের পূর্বপুরুষগণকে রাজেশ্রচোড়ের সেনানায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহিয়াছেন। চোলরাজকে কর্ণাটরাজ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপযোগী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, গোড়রাজমালা-লেখক কল্যাণের চালুক্য-রাজ্যকেই কর্ণাট-রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কর্ণাট-শব্দের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের প্রস্তাবনা পাঠ করিলে বলা যাইতে পারে—অনেকদিন হইতেই প্রাচ্যভারতের গোড়ীয়সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্ম অনেকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই গোড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কল্যাণের চালুক্যরাজ্যের উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল না; তাঁহারও মহীপালদেবের সহিত একবার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে “কর্ণাটলক্ষ্মী” লুপ্ত হইয়াছিল,—মহীপালের বিজয়োগ্রহে নাট্যাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সেনরাজবংশের পূর্বপুরুষগণ এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া কালক্রমে [দক্ষিণরাঢ়ে কর্ণাটরাজ্যের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর], বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের নির্বাচিত পাল-রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্রমণ্ডলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিরাপে “দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌদ্রীন্দ্রবংশোদ্ভব” সেনরাজবংশ এদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। এখনও সেই চেষ্টায়, লেখকবর্গ নানা প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরার মর্শ্বোদ্ঘাটনের আয়োজন করিতেছেন। এইরূপেই ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে—যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা অলীক বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও তাহার প্রয়োজন অস্বীকৃত হয় না। গোড়রাজমালার লেখকও সেইরূপ প্রয়োজনেই ঐতিহাসিক তথ্যের সম্বন্ধান-লাভের আশায়, এই সকল প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে সেইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার সাধন করিতে পারিলে, এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিবে। এ দেশে আধিপত্য লাভ করিবার পূর্বে সেনরাজগণ যে দেশে থাকুন না কেন, তাঁহারা আমাদের দেশের পুরাতন অধিবাসী ছিলেন না—তাঁহারা আগন্তুক তাঁহাদিগের গোড়বিজয় গোড়জনের পরাজয়, তাঁহাদিগের অভ্যুদয় গোড়ীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের প্রথম সোপান। সেখ শুভোদয়া-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল—রামপাল-দেব তনুভাগ্য করিলে মন্ত্রিবর্গ পরামর্শ করিয়া শিবোপাসক কাঠুরিয়া বিজয়-সেনকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত ইহার অনুকূল প্রমাণ

আবিষ্কৃত হয় নাই। পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন-সময়ে সেনরাজ্যে যে কোশ না কোন উপায়, পালরাজ্যের শিথিল মুক্তি হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া গোড়মুণ্ডে একটি আগন্তুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাসাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এ পর্য্যন্ত প্রাচীন লিপিতে যাহা কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সেন-রাজ্য বাহুবলের রাজ্য বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা পাল-রাজ্যের ছায় প্রজাপুঞ্জের নির্বাচন-প্রণালীতে গঠিত গোড়ীয় সাম্রাজ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

এই সাম্রাজ্য পাল-সাম্রাজ্যের ছায় সকল উত্তরাপথে প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। রণ-পাণ্ডিত্যের অভাব না থাকিলেও—কাল্পীধামে, প্রয়াগ-ধামে এবং পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জয়সুভক্ত সংস্থাপিত করিবার প্রমাণ-শ্লোকের অসম্ভাব না থাকিলেও, সেন-রাজবংশের অধিকারভুক্ত প্রাচ্য-সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল এবং অল্পকালের মধ্যে [মুসলমানের সহিত প্রথম সংঘর্ষেই] পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কোন সময়ে, কাহার শাসনকালে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, মুসলমান-শাসন প্রবর্তিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। গোড়রাজমালা-লেখক তদ্বিষয়ে অনেক নূতন তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহা বিচারসহ হইয়াছে কিনা, ভবিষ্যতের তথ্যালোচনায় তাহা মীমাংসিত হইতে পারিবে। সুতরাং তাহাকে লেখক মহাশয়ের তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা-সূচক ব্যক্তি-গত মত বলিয়াই পাঠকগণ তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন।

॥ সেন-রাজবংশ ॥

সেনরাজবংশের অভ্যুদয়লাভের মূল কারণ সহস্রা আবিষ্কৃত হইবার আশা না থাকিলেও, তাঁহাদিগের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্মই অনুসন্ধান-সমিতি চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। তাহাতে উৎসাহ লাভ করিবার পরেই অনুসন্ধান-সমিতি ক্রমে ক্রমে পাল রাজবংশের বিবিধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত করিবারও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনেকদিন হইতে সেই-রাজবংশের এবং পাল-রাজবংশের ইতিহাস-সংকলনের জন্ম নানা চেষ্টা প্রবর্তিত হইয়াছে। সে সকল চেষ্টা পুস্তকালয়ের সাহায্যে [গৃহে বসিয়া], ইতিহাস-সংকলনের চেষ্টা বলিয়া কথিত হইতে পারে। তাহাতেই নানা তর্কবিতর্ক বিপুলতা লাভ করিয়াছে। যে সকল স্তানে

অনুসন্ধান-কার্যে অগ্রসর হইলে তর্কবিতর্ক নিরস্ত হইতে পারিত, তথায় অনু-সন্ধানে প্রযুক্ত হইবার প্রয়োজন অনুভূত হইত না বলিয়া, পুরাতন লিপিতে উল্লিখিত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নানা পুস্তকে মুদ্রিত হইবার পরেও [বাাখ্যা-বিভাগে], তাহার প্রকৃত মৰ্ম অনুভূত হইতে পারে নাই। অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবামাত্র, ইহার বিবিধ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং তাহা বিস্তৃতভাবে “লেখমালায়” আলোচিত হইয়াছে।

ধোয়া কবির পবনদূত আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছিল—বিজয়পুর নামক রাজধানীতে লক্ষ্মণসেনদেবের অভিসেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বজ্রালসেন তাঁহার “দানসাগর” গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন— তাঁহার পিতা বিজয়সেনদেব “বরেন্দ্রে” প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট “শ্লাঘ্যে বরেন্দ্রীতলে” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সমাচার অবগত হইয়াও অনেকে নবদ্বীপকেই “বিজয়পুর” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—বরেন্দ্রের কোন্ নিভৃত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাব-ক্ষেত্র অগোরবে লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহী জেলার [গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত] দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও কেহ কখন তাহার প্রাপ্তি-স্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনু-সন্ধান-সমিতি এইস্থান হইতেই অনুসন্ধানকার্যের সূত্রপাত করিতে গিয়া বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ চিত্রাদিসহ ‘বিবরণমালায়’ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রভূমির সকল স্থানে-বা তাহার বাহিরে কোনও স্থানে, অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, এখনও তাহার বিশ্বাস-যোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন কেবল বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, রাজসাহী জেলার [গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত] বিজয়নগর অঞ্চলেই বিজয়-রাজ্যের নাম লোকমুখে শ্রবণ করা গিয়াছে; তাঁহার রাজবাটীর ধ্বংসা-বশেষের সন্ধানলাভ করা গিয়াছে; এবং তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত বহুসংখ্যক “বিতত তল্ল” কেবল এই অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পুত্র-পৌত্রের ত্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়ঙ্কনাবারের কথা এবং তাঁহার পৌত্রের ত্রীবিক্রমপুরের জয়ঙ্কনাবারে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া [মুসলমান-অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া] পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কথা, তাম্রশাসনে এবং মুসলমান-ইতিহাস-লেখকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

তৎক্ষণ, বিক্রমপুর-অঞ্চলেও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তথ্য; [অনুসন্ধান-সমিতির উপদেশে ও উৎসাহে] শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় অশেষ অধ্যবসায়-বলে অনেক পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিয়াছেন। বিবরণমালায়, শিল্পকলায় এবং গ্রন্থমালায় তাহার নানা পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়রাজমালায় নরপালগণের শাসনকাল নির্ণয়ের জন্ম অধিক আড়ম্বর প্রকাশিত হয় নাই। তাহা এখনও নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তথাপি, যে সকল প্রমাণের আলোচনা করিলে নরপালগণের শাসনকালের আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার কথা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার সময়ে পাল-রাজবংশের শাসনকাল-বিজ্ঞাপক অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন লিপি কলিকাতার যাদুঘরে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে, পাল-নরপালগণের শাসন-কালের সন-তারিখ-নির্ণয়ের নূতন উদ্যম প্রকাশিত হইতে পারিবে।

॥ উপাসক সম্প্রদায় ॥

রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়,—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা। জনসাধারণের সকল কথার প্রধান কথা তাহাদিগের ধর্মবিশ্বাসের কথা। ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তাহাকে একমাত্র কথা বলিলেও অতুক্তি হইবে না। কারণ, ধর্মবিশ্বাসই অধিকাংশ কার্যের গতি-নির্দেশ করিয়াছে;—ধর্মের জন্ম দেবমূর্তি গঠিত হইয়াছে, দেবমূর্তির জন্ম বিচিত্র দেবালয় নির্মিত হইয়াছে, দেবালয়ের প্রচলিত অর্চনা-প্রণালীর জন্ম উপচার-সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, দেব-লোকের প্রীতি-সম্পাদনের আশায় জলাশয় খানিত হইয়াছে, চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, পাস্থশালা নির্মিত হইয়াছে, বিবিধ বিদ্যালয়ে শাস্ত্রালোচনা প্রচলিত হইয়াছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যাপারে উপার্জিত অর্থ, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন সাধিত করিয়া দেব-কার্যেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে যে সকল আচার-ব্যবহার জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালীর জাতিগত পরিচয় লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। কোন্ পুরাকাল হইতে কিরূপ ঘটনাচক্রে, এ দেশের অধিবাসিবর্গ তাহাদিগের শিক্ষাদীক্ষার এবং আচার-ব্যবহারের প্রভাবে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার কথাই প্রধান কথা।

অনুসন্ধান-সমিতি তদ্বিষয়ে যে সকল অনুসন্ধান-কার্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, “গোড়ীয় উপাসক-সম্প্রদায়” নামক গ্রন্থাংশে তাহা আলোচিত হইবে। বঙ্গভূমি যে বহুযুগের বহুবিধ শিক্ষা-দীক্ষার মিলন-ভূমি, — আপাত-প্রতীয়মান মত-পার্থক্যের সমন্বয়ভূমি, — অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সার কৌতূহলপূর্ণ সাধনভূমি — তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই ভূমিকে স্নতস্ত্র কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দিগ্দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে বঙ্গভূমির চতুঃসীমাবৃত্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ইতিহাস বলিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় নাই। তাহা একদিকে যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাস, অত্ৰ্যদিকে সেইরূপ মানব-ইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। মানব-প্রতিভা, দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে, কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর পরিণতি লাভের চেষ্টা করিলেও তাহার অভ্যন্তরে সমগ্রমানব-সমাজের অশ্বুট আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালীর ইতিহাসেও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে। সে ইতিহাস সন-তারিখের তালিকায় ভারাক্রান্ত না হইয়াও, অনেক জাতবা তথোর সন্ধান প্রদান করিতে পারিবে।

যাঁহারা এই অধমকে সারথ্যে বরণ করিয়া অকাতরে বরেন্দ্র-ভ্রমণের অশেষ ক্লেশ সস্থ করিয়াও, অকুণ্ঠিত-চিত্তে অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধ্যয়নানুরাগ, অধ্যবসায়, তথ্যাবিকারে উৎসাহ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহারা দিঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্-এ, এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ। যাঁহারা এই অনুসন্ধান-কার্যে বিবিধ প্রকারে সাহচর্য্য করিয়া অনুসন্ধান-কার্যকে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক গোলাম ইয়াজ্-দানী এম্-এ, শ্রীমান্ শ্রীরাম মৈত্র, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাখ্যাল বি-এল, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র শাস্ত্রী বি-এ, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এম্-এ, শ্রীমান্ দেবেন্দ্রগতি রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি-এল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ এবং অনুসন্ধান-সমিতির স্নেহাস্পদ চিত্রকর শ্রীমান্ অনাথবন্ধু মৈত্রয়ে।

যাঁহারা এই অনুসন্ধান-কার্যের পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের মধ্যে রাজসাহী বিভাগের মাননীয় কমিশনার সুপণ্ডিত এফ্., জে., মোনাহেন মহোদয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া

বিবিধ অনুসন্ধান-ক্ষেত্র স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছেন, সংগৃহীত পুরাকীর্তির নিদর্শন-নিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং গুরবমিশ্রের গরুড়-স্তম্ভের সংরক্ষণ চেষ্টার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের ধর্মাবাদের পাত্র হইয়াছেন। অশু পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং দীঘাপতিয়ার মাননীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর অনুসন্ধান-সমিতির অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার পাত্র।

যাঁহারা অযাচিতভাবে অনুসন্ধান-সমিতিকে অভ্যর্থনা করিয়া আতিথেয়, উপদেশে, অজ্ঞাত অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের সন্ধান-প্রদানে, সাহায্যে, সন্ধ্যাবহারে বিবিধ বিধানে উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্রৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, দীঘাপতিয়ার চতুর্থ রাজকুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় (রঙ্গপুর), বর্দ্ধনকুটির রাজকুমার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ রায় সাহেব (দিনাজপুর), রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী (কাশিমপুর—রাজসাহী), রায় বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজসাহী), শ্রীযুক্তা মীনা কুমারী, শ্রীযুক্তা হেমলতা চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক (রাজসাহী), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, (মহাদেবপুর—রাজসাহী) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মনহলি—দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল (বালুরঘাট—দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত কালীচরণ সাহা, শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী, হাজি সেখ লালমহম্মদ (রাজসাহী), হাজি সেখ সিরাজুদ্দীন (বগুড়া), শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত-গুপ্ত, এম্-এ, বি-ই, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ, বি-এল, (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত অধিকারী, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় (বালুরঘাট—দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল-চৌধুরী (রাণাঘাট—নদীয়া) এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সাহা-চৌধুরী, বি-এল, মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ উপসংহার ॥

যাঁহারা সমিতির সদস্যগণের পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়া, বিবিধ দুর্গম স্থানে অন্নানবদনে সেবাকার্যে ব্যাগৃত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দয়ারামপুর-রাজবাটীর কৰ্মচারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণলাল গোস্বামী, যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত কারকুন, শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মুন্সীর নাম উল্লেখযোগ্য।

যিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়ানানা প্রকারে অনুসন্ধান-সমিতিতে উত্তরোত্তর বিবিধ তথ্য-সঙ্কলনের সুযোগদান করিয়াও, আপন নাম লোক-সমাজের নিকট অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন, অনুসন্ধান-সমিতির কল্যাণকাজ্জী সেই প্রিয়দর্শন দীর্ঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁহার কল্যাণকামনা করিয়া এই সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা সমাপ্তিলাভ করিল।

॥ শিবমস্ত ॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

গৌড়রাজমালা

১। গঙ্গরিডি ।

৩২৬ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মেরিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা-তীরে উপনীত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার শিবিরে “প্রাসিই” এবং “গণ্ডরিডয়” নামক দুইটি রাজ্যের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সেকেন্দরের ইতিবৃত্ত-লেখকগণ যে ভাবে এই দুইটি রাজ্যের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে “গণ্ডরিডয়” সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন।*

ইহার কিছুকাল পরে, গ্রীকদূত মেগাস্থিনিন্স পাটলিপুত্র-নগরে মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র-নগর যে জনপদের রাজধানী ছিল, মেগাস্থিনিন্স তাহাকে “প্রাসিই” [প্রাচ্য] বলিয়া অভিহিত করিয়া, উহার পূর্বদিকে “গঙ্গরিডি” নামক আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক লেখকগণের উল্লিখিত “গণ্ডরিডয়” এবং “গঙ্গরিডি” অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত হয়। মেগাস্থিনিন্সের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ-সম্বলিত মূল “ইণ্ডিকা” গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবলম্বন।† ডিওডোরস্ মেগাস্থিনিন্সের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গানদী “গঙ্গরিডিই দেশের পূর্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গরিডিই-নিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণ-হস্তী আছে। এই-নিমিত্ত তাঁহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীয় রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই; কারণ, অত্যাশ্র দেশের অধিবাসীরা গঙ্গরিডিই-গণের অসংখ্য এবং দুর্জয় রণহস্তী-নিচয়কে ভয় করে।‡ বাঙ্গালার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত তাহা এখন “রাঢ়” নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে এই প্রদেশ “সুক্ষা” নামে পরিচিত ছিল। “রাঢ়” নামটিও প্রাচীন। “আচারাক্স-সূত্র” নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন জৈন-গ্রন্থে (১।৮।৩) “লাঢ়” বা রাঢ়দেশ উল্লিখিত আছে।

* McCrindle's Invasion of Alexander the Great (Westminster, 1893).

† McCrindle's Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian (Calcutta, 1877).

‡ McCrindle's Megasthenes, pp. 33-34.

“গঙ্গরিডিই”-রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ-রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাঙ্গালার অপর দুইটি বিভাগ, —পুণ্ড্র [বরেন্দ্র] এবং বঙ্গ,—নিশ্চয়ই “গঙ্গরিডিই”-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং কলিঙ্গও এক সময়ে এই রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল। প্লিনি [মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া] লিখিয়া গিয়াছেন,—“গঙ্গানদীর শেষভাগ ‘গঙ্গরিডি-কলিঙ্গ’-রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই রাজ্যের রাজধানী পর্থলিস্। ৬০,০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ হস্তী সম্বিষ্ট থাকিয়া, এই রাজ্যের অধিপতির দেহরক্ষা করিতেছে।”* আর একজন লেখক [সলিন্] মেগাস্থিনিসের এই অংশ স্বতন্ত্র আকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, “গঙ্গরিডিগণ দূরতম (প্রত্যস্ত) প্রদেশে বাস করে। তাহাদের রাজার সেনামধ্যে ১০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী এবং ৬০,০০০ পদাতি আছে।” প্লিনি কর্তৃক “গঙ্গরিডি” এবং “কলিঙ্গ” [কলিঙ্গ] একত্র উল্লিখিত দেখিয়া মনে হয়, কলিঙ্গ তখন গঙ্গরিডি-রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান উড়িষ্যা এবং উড়িষ্যার দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে তখন কলিঙ্গ বলিত। পরবর্তীকালে যখন উড়িষ্যা ওড় বা উংকল নামে পরিচিত হইল এবং প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণভাগই কেবল কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইতে লাগিল তখনও উংকল “সকল কলিঙ্গে”র বা “ত্রিকলিঙ্গের” এক কলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত।

মেগাস্থিনিসের সময় [মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে] “গঙ্গরিডি-কলিঙ্গ”র স্থায় অঙ্গরাজ্যও স্বাধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে, বা তদীয় পুত্র বিন্দুসারের সময়ে, অঙ্গদেশে মৌর্য্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বিন্দুসারের পুত্র সম্রাট্ অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। অশোকের শিলাশাসনে [১৩শ অনুশাসনে] কলিঙ্গ-জয় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—“দেব-

* Ibid. p. 135. মেক্সিকুল এই অংশের যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে “গঙ্গরিডিই” এবং “কলিঙ্গ” দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি টীকায় লিখিয়াছেন—“The common reading, however—‘Gangaridum Calingaram, Regia,’ &c., makes the Gangarides a branch of the Kalingæ. This is probably the correct reading.” Early History of India (second edition, p. 146) প্রণেতা ডি. এ. স্মিথ্ এই টীকা এবং পরে উদ্ধৃত (McCrinkle, p. 155) সলিন্-প্রস্তুত মেগাস্থিনিসের বিবরণ লক্ষ্য না করিয়া লিখিয়াছেন—মেগাস্থিনিসের মতে কলিঙ্গ-পতির ৬০০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ রথহস্তী ছিল।

গণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ্যাভিষিক্ত হইবার আট বৎসর পরে, কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। সার্ক লক্ষ লোক দাসড়-পাশে বদ্ধ হইয়াছিল, লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল এবং বহু লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।” কলিঙ্গ-জয় উপলক্ষে হত্যাকাণ্ড এবং লোকক্ষয় দেখিয়া, অশোক এতদূর সন্তপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি দিগ্বিজয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। যে রাজ্য জয় করিতে এত নরহত্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই রাজ্য যে কেবল কলিঙ্গ-দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন বোধ হয় না। মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত যুক্ত “গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি”-রাজাই সম্ভবতঃ অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অশোকের শিলাশাসনসমূহে বাঙ্গালার কোন অংশেরই নামোল্লেখ না থাকিলেও, বাঙ্গালা যে অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহার জনশ্রুতিমূলক প্রমাণের অভাব নাই। “অশোকাবদান” গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন-নগর অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। পরিত্রাজক ইউয়ান্ চোয়াং বা হিউয়েন সিয়াং (৬১৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ নামক বাঙ্গালার চারিটি প্রধান নগরের উপকণ্ঠই অশোক-রাজ-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধস্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, অন্ধ এবং কলিঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। “গঙ্গারিডি”-হয়ত সেই সময়েই কলিঙ্গের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকিবে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাঙ্গালীর রণ-পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর রোম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহাকাবি ডার্সিল্ [“জর্জিক্স” কাব্যের তৃতীয় সর্গের সূচনায়] লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেণ্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্শ্বর-প্রস্তরের একটি মন্দির নির্মাণ করিবেন এবং সেই মন্দিরে রোম-সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া, “মন্দিরের দ্বারফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্তের দ্বারা ‘গঙ্গারিডিগণের মুক্তের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিবেন।” * ডার্সিলের পক্ষে ভারতবর্ষের বিবরণ সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ভারতের রাজস্ববর্গ তৎকালে রোমে দূত প্রেরণ করিতেন এবং ভারতের সহিত রোমের ঘনিষ্ঠ

* “On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaridæ, and the arms of our victorious Quirinius.” *Georgics* iii, 27, translated by Ransdale and Lee.

বাণিজ্য-সম্বন্ধও বর্ধমান ছিল। ভার্জিল্ “জর্জিক্সের” প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে রোমে হস্তি-দন্তের আমদানী হইত।

তৎকালে ‘বারগোসা’ [ভুগুচ্ছ বা ডরোচ] এবং ‘গঙ্গরিডির’ প্রধান নগর ‘গঙ্গে’ ভারতের প্রধান বন্দর ছিল এবং এই দুইটি বন্দর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পাদিত হইত। “পিরিপ্লাস্ ইরিথ্রি মেরি” নামক [খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত] একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,—“গঙ্গে”-বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানী হইত। খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমি লিখিয়া গিয়াছেন, “গঙ্গার মোহানা-সমূহের সমীপবর্তী প্রদেশে গঙ্গরিডিগণ বাস করে। এই (রাজ্যের) রাজা ‘গঙ্গে’ নগরে বাস করেন।”† টলেমি যে বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণ অবগত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থোক্ত গঙ্গার মোহানা-সমূহের বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য লেখকগণ গঙ্গার একটির অধিক মোহানার পুরিচয় দিতে পারেন নাই। কিন্তু টলেমি গঙ্গার পাঁচটি মোহানার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। টলেমি যে যুগের বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই যুগে আর্য্যাবর্ডে কুষাণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুষাণ-প্রভাব যে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতলাভ করিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বরেন্দ্রের অন্তর্গত বগুড়া জেলায় কুষাণ-সম্রাট্ বাসুদেবের (?) একটি সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।* কিন্তু এইরূপ সামান্য প্রমাণ অবলম্বনে কুষাণ-সাম্রাজ্যের সহিত বাঙ্গালার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

২॥ গুপ্ত-সাম্রাজ্য ॥

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে [মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে] মগধে আর একটি মহা-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছিল। যিনি

† McCrindle's Ancient India as described by Ptolemy, (Calcutta, 1883 p. 172.) আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মেগাস্থিনিস্, টলেমি প্রভৃতির উল্লিখিত জনপদ, নগর এবং নদনদীর দেশীয় নাম এবং স্থিতিস্থান নিরূপণের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সূত্রাং বাহুলা ভয়ে তাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত হইল না।

* “বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির” অন্যতম সভ্য, বহুবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, এই মুদ্রাটি কনৈক দিবন্ধর পল্লীবাসীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাগী মাঝেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার নামও চন্দ্রগুপ্ত। ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী [এই চন্দ্রগুপ্তের অভিষেককাল] হইতে “গুপ্তাক” নামক একটি অভিনব অঙ্গ-গণনার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সুধীগণ স্থির করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র [লিচ্ছবি-রাজকুলের দৌহিত্র] সমুদ্রগুপ্ত স্রীয় ভুজবলে এই অভিনব সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন। প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ-গাড়ে উৎকীর্ণ কবি-হরিশেখর বিরচিত প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত [“সমতট-ডবাক্-কামরূপ-নেপাল-কর্তৃপুরাদি-প্রত্যন্তনৃপতিভিঃ”] প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণ কর্তৃক [“সর্বকর-দানাজ্ঞা-করণ-প্রণামাগমন-পরিতোষিত-প্রচণ্ড-শাসনস্থ”] সর্বকরদান-আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।† বাঙ্গলার কোন্ অংশ যে “ডবাক্” নামে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন। কারণ, এ পর্য্যন্ত আর কোথাও “ডবাক্” নামটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সমতট [বঙ্গ] এবং “ডবাক্” ব্যতীত বাঙ্গলার অপরাপর অংশ,—পুণ্ড্র [বরেন্দ্র] এবং রাঢ়,—সম্ভবত খাস গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল।

আনুমানিক ৩৮০ খৃষ্টাব্দে [সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পরলোকান্তে] তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্তী [মিহরৌলী নামক স্থানে অবস্থিত] একটি লৌহ-স্তম্ভে “চন্দ্র” নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতির দিগ্বিজয়-কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, এই নৃপতি “বঙ্গদেশে সমরে দলবদ্ধ বহুসংখ্যক শত্রুকে পরাভূত করিয়াছিলেন।”‡ কেহ কেহ এই “চন্দ্র”কে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর, সম্ভবতঃ বঙ্গের বা সমতটের সামন্তগণ স্বাভাবিক অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেই বিদ্রোহ-দমনের জন্ত সম্রাট বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন আর্ঘ্যাবর্তের সম্রাট তখন পরিক্রাজক ফা হিয়ান্ আর্ঘ্যাবর্ত-ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন এবং ভ্রমণের শেষ হইই বৎসর (৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ) তাম্রলিপি-বন্দরে বাস করিয়া বৌদ্ধ-গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করণে এবং দেব-মূর্তির চিত্র সঙ্কলনে নিরত ছিলেন।

† Fleet's Gupta Inscriptions, p. 6.

‡ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 141.

“যশোবর্ত্তয়ত: প্রতীপম্বরসা শক্রন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গবাহুবধিন্দোনোভিসিখিতা খাজান স্বাভিজ্ঞৈঃ।”

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর প্রথম কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১১৩ গুপ্ত-সম্বতে [৪৩২ খৃষ্টাব্দে] উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তের সময়ের একখানি তাম্রশাসন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।* কুমারগুপ্ত দীর্ঘকাল [৪১৩—৪৫৫ খৃষ্টাব্দ] সাম্রাজ্য পালন করিয়া পরলোক গমন করিলে, তদীয় পুত্র ক্ষন্দগুপ্ত পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোধ করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলায় ক্ষন্দগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঢাকা, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে গুপ্ত-সম্রাটদিগের মুদ্রার চন্দ্রের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষন্দগুপ্তের সময় হইতে মধ্য-এসিয়াবাসী হুণগণ আসিয়া উত্তরাপথ [আর্ঘ্যাবর্ত] আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সম্রাট ক্ষন্দগুপ্ত প্রথমবারের আক্রমণকারিগণকে পরাভূত করিয়া সাম্রাজ্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্ষন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ তেমন যোগ্য লোক ছিলেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, হুণ-নায়ক তোরমাণশাহ আসিয়া সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্ধ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশোধর্ম-বিষ্ণুবর্দ্ধন তোরমাণের পুত্র হুণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া, পুনরায় সাম্রাজ্যের ঐক্য-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালবদেশের অন্তর্গত দসোর বা মন্দসোর-নগরের নিকট প্রাপ্ত [যশোধর্ম-কর্তৃক স্থাপিত] দুইটি প্রস্তর-স্তম্ভে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে—“গুপ্তনাথগণ” এবং “হুণাধিপগণ” যে সকল দেশ অধিকারে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই সকল দেশও উপভোগ করিয়াছিলেন; এবং পূর্বদিকে

“আলৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তালবনগহনোপত্যকাদামহেন্সাৎ”

“লৌহিত্য [ব্রহ্মপুত্র] নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া, গহন-তালবন আচ্ছাদিত মহেন্স-গিরির উপত্যকা [কলিঙ্গ] পর্য্যন্ত” বিস্তৃত ভূভাগের সামন্তগণ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিল (৪—৬ শ্লোক)।† মন্দসোর হইতে সংগৃহীত [যশোধর্মের শাসন-সময়ের] “মালবগণস্থিতি” হইতে গণিত অকের ৫৮৯ সালের আর একখানি শিলা-লিপিতে উক্ত হইয়াছে—

* “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,” ১৬ ভাগ, ১১২ পৃঃ।

† Fleet's Gupta Inscriptions, p. 146.

‡ Ibid, p. 152, V. A Smith তাঁহার Early History of India (2nd. Ed. pp. 301-302) গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—শিলালিপিতে যশোধর্ম সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ১১০৯ সালের Journal of the Royal Asiatic Society পত্র হর্শলি এই মতের প্রতিপাদন করিয়াছেন। হর্শলির যুক্তি সমীচীনতর বোধ হয়।

“প্রাচী নৃপান্ সুবহতশ্চ বহনুদীচঃ
সাম্না যুধা চ বশগান্ প্রবিধায় যেন ।
নামাপরং জগতি কান্তমদো ভূরাপং
রাজাধিরাজ পরমেশ্বর ইতুদৃঢ়ম ॥”

“যিনি [যশোধৰ্ম্ম] প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচ্য এবং বহুসংখ্যক উদীচ্য-নৃপতি-গণকে সন্ধিসূত্রে এবং সংগ্রামে বশীভূত করিয়া, জগতে জগতি-সুখকর এবং দুর্লভ ‘রাজাধিরাজ পরমেশ্বর’ এই দ্বিতীয় নাম ধারণ করিয়াছেন ।” পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন—‘মালবগণস্থিতি’ হইতে গণিত অক্ষই ‘বিক্রম-সম্বৎ’ নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে । সুতরাং এই প্রশস্তিতে প্রাচ্য-নৃপগণের উল্লেখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, ৫৮৯ মালব-বিক্রমাব্দের [৫৩০ খৃষ্টাব্দের] পূর্বেই যশোধৰ্ম্ম লৌহিতানদের উপকণ্ঠ হইতে মহেন্দ্র-গিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ।

৩ ॥ গোড়াধিপ-শশাঙ্ক ॥

মহারাজাধিরাজ যশোধৰ্ম্মের পরলোক গমনের পর, কে যে উত্তরাপথের সার্কবভৌম নরপতি পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অথবা কেহ সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা, তাহা বলা কঠিন । খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের শেষার্ধ্বে, যে সকল নরপাল বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল মৌখর বা মৌখরি-বংশীয় ঈশানবৰ্ম্মা এবং তদীয় পুত্র শৰ্কবৰ্ম্মাকে “মহারাজাধিরাজ” উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায় ।* মৌখর-বংশীয় “মহারাজাধিরাজগণের” প্রভাব বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল কি না, বলা কঠিন । মগধের অপর গুপ্ত-বংশীয় কুমারগুপ্তের সহিত ঈশানবৰ্ম্মার যুদ্ধ চলিয়াছিল ।† ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রশাসনে যথাক্রমে ধৰ্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেব নামক তিনজন “মহারাজাধিরাজ” বা সম্রাটের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ।‡ ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে স্থানীশ্বরের [ধানেশ্বরের]

* Fleet's Gupta Inscriptions, p. 220.

† Ibid, p. 202.

‡ Three copper-plate grants from East Bengal (Indian Antiquary, 1910, pp. 193-216) ; The Kotwalipādā spurious grant of Samacāradeva (Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1910, p. 435)

ডাক্তার হৰ্শলি মনে করেন—ধৰ্ম্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ যশোধৰ্ম্মের নামান্তর এবং গোপচন্দ্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পুত্র । The evidence of the Faridpur Grants নামক এশিয়াটিক্ সোসাইটির জার্নালে প্রকাশার্থ প্রবন্ধে বঙ্গবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিপতি প্রভাকর-বর্দ্ধন উত্তরাপথের পঞ্চম ভাগে স্বীয় প্রাধাত্য স্থাপন এবং “মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর-বর্দ্ধন সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, উত্তরাপথের সার্কর্ভোম নৃপতির পদ লাভের জগু ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। প্রভাকর-বর্দ্ধনের জামাতা মৌখরি গ্রহবর্মা পাঞ্চালের রাজধানী কাণ্ডকুঞ্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। প্রভাকর-বর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র মালব হইতে দেবগুপ্ত (?) সসৈন্য কাণ্ডকুঞ্জাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। মালবরাজ কাণ্ডকুঞ্জে উপনীত হইয়া, যুদ্ধে গ্রহবর্মাকে নিহত এবং রাজপুরী অধিকৃত করিয়া, তদীয় পত্নী স্থানীশ্বররাজ-দুহিতা রাজ্যশ্রীকে লৌহশৃঙ্খলাবন্ধ-চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া, স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই দ্বঃসংবাদ পাইবামাত্র প্রভাকর-বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন দশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মালব-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া সহজেই মালব-সৈন্যের পরাভব সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিজয়ের জ্ঞাপ্তি দূর হইতে না হইতে, ভগিনীর কারা-মোচনের পূর্বেই তিনি প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অভিনব প্রতিদ্বন্দ্বী—“গোড়াধিপ” শশাঙ্ক।*

শশাঙ্কের পূর্বে ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে তাঁহার এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোড়-রাজ্যের অভ্যুদয় নির্মেঘ-গগনে বিদ্যুৎ-প্রভার শ্যায় একেবারে আকস্মিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। “হর্ষচরিত”-প্রণেতা বাণভট্ট শশাঙ্ককে “গোড়াধিপ”, “গোড়” এবং কখনও বা বিদ্রোহ-বশত “গোড়াধম” এবং “গোড়-ভুজঙ্গ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইউয়ান্ চোয়াং “কর্ণসুবর্ণের রাজ্য” বলিয়া শশাঙ্কের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত অভিধানে “গোড়” শব্দের পর্যায়ে “পুণ্ড্র”, “বরেন্দ্রী” এবং “নীবুং” উল্লিখিত রহিয়াছে।† গোড়ে বা বরেন্দ্র-দেশে শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি “গোড়াধিপ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী “কর্ণসুবর্ণ” রাঢ়দেশে, [মুর্শিদাবাদ-নগরের ১২ মাইল ব্যবধানে] অবস্থিত ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যিনি কর্ণসুবর্ণ হইতে কাণ্ডকুঞ্জ জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী

নানাবিধ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন, এই চারিখানি তাম্রশাসনই জাল বা কুট-শাসন। রাখালবাবু প্রাচীন লিপিতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডঃ হর্নলি এই ক্ষেত্রে একজন মহারথী। এই উভয় বিশেষজ্ঞের মধ্যে উপস্থিত তর্কের মীমাংসা না হইলে, এই সকল তাম্রশাসন হইতে ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলন সুকঠিন।

• বাণভট্ট প্রণীত “হর্ষচরিত” বর্ষ উদ্ধৃতি।

† “পুণ্ড্রাঃ য়ার্বরেন্দ্রা-গোড়-নীবুতি” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মগধ ও মিথিলায় প্রাধান্য-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত রোটার্গ-গড়ে প্রাপ্ত একটি পাষণ-নির্মিত মুদ্রার ছাঁচে “মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব” উৎকীর্ণ দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ইহা গোড়াধিপ-শশাঙ্কের মুদ্রার ছাঁচ। এই অনুমান সত্য হইলে; মনে করিতে হইবে, শশাঙ্ক প্রথমে কোনও সার্বভৌম নরপালের সামন্তশ্রেণী-ভূক্ত ছিলেন; এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, যে সুযোগ পশ্চিমদিকে স্থানীয়দের প্রভাব-বর্ধন এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে, পূর্বদিকে “লৌহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে গহনতালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র-গিরির উপত্যকা” পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া, তিনি গোড়-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গোড়-মণ্ডল দীর্ঘকাল উত্তরাপথ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিলেও ইতিপূর্বেই ভাষায় এবং সাহিত্যে “গোড়জনে”র স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী [কাব্যাদর্শে] ভাষার মধ্যে “গোড়ী” নামক স্বতন্ত্র প্রাকৃত-ভাষার এবং কাব্যরচনায় “গোড়ী-রীতি” নামক স্বতন্ত্র রচনা-রীতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। “গোড়ী”-ভাষা এবং “গোড়ী”-রীতি গোড়-রাজ্যের অগ্রদূতরূপে গৃহীত হইতে পারে।

ঐক কোন খানে যে গোড়াধিপের সহিত রাজ্যবর্ধনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, বাণভট্ট তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া যান নাই। “হর্ষচরিতের” ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে বর্ণিত হইয়াছে, রাজ্যবর্ধন স্থানীয় হইতে যুদ্ধযাত্রা করিবার পর “বহুদিবস অতীত হইলে”, [অতিক্রান্তে বহু বাসরে য়] হর্ষ সংবাদ পাইলেন, “তঁহার ভ্রাতা অক্লেশে মালবসৈন্যের পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ হইলেও গোড়াধিপ তঁাহাকে মিথ্যা লোভ দেখাইয়া, বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া স্বভবনে (লইয়া গিয়া) অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া গোপনে নিহত করিয়াছেন।”* ইউয়ান্ চোয়াংএর গ্রন্থে এই বর্ণনার কিঞ্চিৎ বিকৃত প্রতিধ্বনি পরিরক্ষিত হইয়াছে। ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন, প্রভাববর্ধনের মৃত্যুর পর “(হর্ষ-বর্ধনের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সম্ভাবে রাজ্য-শাসন করিতেছিলেন। এই সময় ভারতের পূর্বাংশস্থিত কর্ণসুবর্ণের রাজ্য শশাঙ্ক অনেক সময় তঁহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন, ‘যদি সীমান্ত-প্রদেশের রাজা ধার্মিক হয়, তবে স্বরাজ্যের অকল্যাণ হয়।’ এই কথা শুনিয়া, তঁাহারা রাজ্য

* জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত “হর্ষচরিত” (কলিকাতা, ১৮২২ খৃষ্টাব্দ),

রাজ্যবর্ধনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।” †

বাণভট্ট-প্রদত্ত রাজ্যবর্ধন-নিধনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। একজন প্রতিযোগী (মালবাধিপতি) যঁাহার ভগিনী-পতিকে নিহত করিয়া, ভগিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ-চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া-ছিল, সেই রাজ্যবর্ধন যে যুথের কথায় ডুলিয়া, একাকী নিরস্ত্র আর একজন প্রতিযোগীর [গোড়াধিপের] ভবনে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। “হর্ষচরিত” পূর্বাপর আলোচনা করিলে প্রকৃত ঘটনার কতক আভাস পাওয়া যায়। রাজ্যবর্ধন যখন কাশ্যকুজাভিমুখে যাত্রা করেন তখন তাঁহার মাতুল-পুত্র ভণ্ডি অশ্বারোহী-সেনার অধিনায়করূপে তাঁহার অনুগমন করিয়া-ছিলেন। ‡ হর্ষ ভাতৃ-বিয়োগের সংবাদ পাইবামাত্র, “পৃথিবী নির্গৌড়” করিবার জগু সসৈন্য কিয়দূর অগ্রসর হইলে, সংবাদ পাইলেন—রাজ্যবর্ধনের বাহুবলে উপার্জিত মালব-রাজ্যের দ্রব্যাদি লইয়া ভণ্ডি আসিতেছেন। § ভণ্ডির আনীত লুণ্ঠিত দ্রব্য মধ্যে বহুসংখ্যক হস্তী, দ্রুতগামী অশ্ব, নানাবিধ অলঙ্কার, ধনপূর্ণ কুন্ত এবং নিগড়াবদ্ধ কয়েদীগণ ছিল। * ভণ্ডি শিবিরে উপনীত হইলে, হর্ষ তাঁহাকে ভাতৃ-মরণবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ভণ্ডি যথাযথ সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর নরপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজ্যশ্রীর সংবাদ কি?” (ভণ্ডি) পুনরায় বলিলেন, “দেব! আমি লোকের মুখে শুনিতে পাইয়াছি, রাজ্যবর্ধন স্বর্গারোহণ করিলে এবং গুপ্ত নামক ব্যক্তি কর্তৃক কাশ্যকুজ অধিকৃত হইলে, রাজ্যী রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া, [সানুচরী] বিষ্ণারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানে অনেক লোক প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ এখনও প্রত্যাগত হয় নাই।” † রাজ্যশ্রীর কারামুক্তি-কাহিনী অক্ষম উচ্ছ্বাসে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

† Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I, p. 210.

‡ হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, ৪২৮ পৃঃ।

§ হর্ষচরিত, সপ্তম উচ্ছ্বাস, ৩০০ পৃঃ।

* হর্ষচরিত, সপ্তম উচ্ছ্বাস, ৩০৩—৩০৫ পৃঃ।

† “সমতিক্রান্তে চ কিয়তাপি কালে ভাতৃমরণ-বৃত্তান্তমপ্রাদীৎ। অথ অকথয়চ্চ যথাবৃত্তমবিলং ভণ্ডিঃ। অথ নরপতিঃ তদুবাচ রাজ্যশ্রী-ব্যতিক্রমঃ ক ইতি। স পুন-রবাদীৎ দেব! দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্ধনে, গুপ্তনামা চ গৃহীতে কুশঙ্কলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিজগু বহুনাং বিষ্ণ্যাটবীং .সপরিবারা প্রবিষ্টা ইতি লোকতো বার্ত্তমুশ্রণবন্। অশেষরক্তং তাং প্রতি প্রভূতাঃ প্রহিতা জনা, ন অন্তঃপি নিবর্ত্তন্ত ইতি।” ৩০২—৩০৩ পৃঃ।

হর্ষ যখন বিদ্বারগণ্যে ডগিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন তখন “অনুচরিগণের নিকট হইতে ডগিনীর কারাবাস হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়াধিপের আক্রমণ-কালে গুপ্ত নামক কুলপুত্র-কর্তৃক কাশ্যকুঞ্জের কারাগার হইতে তাঁহার নিষ্কাশন, কারা-বহির্গত হইয়া রাজ্যবর্জনের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ, শুনিয়া আহার ত্যাগ, অনাহারে বিদ্বারগণ্যে ভ্রমণক্লেশ এবং হতাশ হইয়া অগ্নি-প্রবেশের উদ্যোগ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন।”

এখানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, রাজ্যবর্জন মালব-রাজকে পরাজিত করিয়া নিজকে নিরাপদ জ্ঞান করিয়া, যুদ্ধ-লক্ষ্য গজ, অশ্ব, দ্রব্যাদি এবং বন্দি-গণকে সেনাপতি ভণ্ডির সহিত স্থানীশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং দ্বয়ং ডগিনীর উদ্ধার-সাধনের জন্ত কাশ্যকুঞ্জ যাত্রা করিয়াছিলেন। কাশ্যকুঞ্জের নিকটবর্তী হইয়াই, হয়ত, রাজ্যবর্জন সসৈন্য গৌড়াধিপ কর্তৃক স্বীয় পথ রুদ্ধ দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাজ্যবর্জনের দশ সহস্র অশ্বরোহীর মধ্যে কতক মালবপতির সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল এবং কতক লুপ্তিত প্রব্য [রক্ষার্থ] ভণ্ডির সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজ্যবর্জনের সহিত তখন হয়ত ছয় সাত হাজারের অধিক অশ্বরোহী ছিল না। পক্ষান্তরে, গৌড়াধিপ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক সেনাবল না লইয়া, কাশ্যকুঞ্জের মত দূরদেশ-জয়ে যাত্রা করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং গৌড়াধিপের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকিলে, রাজ্যবর্জন হয় যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত হইয়াছিলেন বা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; আর না হয়, পরাজয় নিশ্চিত জ্ঞানিয়া বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্জন মিথ্যা-প্রলোভনে যুদ্ধ হইয়া, স্বেচ্ছায় গৌড়াধিপের শিবিরে গমন করেন নাই, গতান্তর ছিল না বলিয়াই গিয়াছিলেন। হর্ষবর্জনের তাম্রশাসন-নিচয়ে রাজ্যবর্জনের মৃত্যুর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও এই অনুমানের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে। যথাঃ—

“রাজানো যুধি দুষ্-বাজিন ইব জীদেবগুপ্তাদয়ঃ

কৃত্বা যেন কশাপ্রহার-বিমুখাঃ সর্ব্ব সমং সংযতাঃ।

‡ “বর্জনাং প্রভৃতি বিস্তারতঃ স্বয়ং কান্যকুঞ্জীয় গৌড়-লক্ষ্মণ গুপ্তিতো গুপ্তনাম্না কুলপুত্রেন নিষ্কাশনং, নির্গতায়াক রাজ্যবর্জন-মরণ-শ্রবণং শ্রুত্বা আহার-নিরাকরণ মনোহার-পরাহতায়াক বিদ্বাটবী-পর্যটন-খেদং, জাতনির্বোদায়া পাবক-প্রবেশোপক্রমণং বাবৎ সর্বমশুণোং ব্যতিক্রমং পরিজনতঃ। ৩৩৪ পৃঃ।

* Banskhera Plate of Harsha, Epigraphia Indica, Vol. IV. pp. 210—211; Madhuvan Plate, Ep. Ind. Vol. VII, pp. 155—160, Sonpat Seal, Fleet's Gupta Inscription.

উৎখায় দ্বিমতো বিজিত্য বসুধাকৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং

প্রাণানুজ্জ্বিতবানরাতি-ভবনে সত্যানুরোধেন যঃ ॥”

“যিনি কশাঘাতে সংযত দুর্ঘট অশ্বের মায় শ্রীদেবগুপ্তাদি সমস্ত রাজগণকে সমভাবে সংযত করিয়াছিলেন, যিনি শত্রুকুল নির্মূল করত বসুধা জয় করিয়া এবং প্রজাপুঞ্জের প্রিয়কার্য সাধন করিয়া সত্যরক্ষা করিতে গিয়া শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।”

প্রশস্তিকার “সত্যানুরোধে” কথাটি বলিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, রাজ্য-বর্জন স্বেচ্ছায় গোড়াধিপের ভবনে গমন করেন নাই।

রাজ্যবর্জন নিহত হইলে কাণ্ডকুঞ্জ নির্বিবাদেই গোড়পতির হস্তগত হইয়া-ছিল। তিনি গুপ্ত নামক ব্যক্তির হস্তে কাণ্ডকুঞ্জ-নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্ভবতঃ গোড়াধিপের আদেশক্রমে রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিয়া, তাঁহাকে অনুচরীগণের সহিত যথাভিলষিত স্থানে গমন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীর কারামুক্তি শশাঙ্কের তৎকাল-দুর্লভ সহৃদয়তার পরিচায়ক।

রাজ্যবর্জনকে নিহত করিলে সহজে উত্তরাপথে স্থায়ী প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইবেন, এই আশায় শশাঙ্ক শরণাগত রাজ্যবর্জনকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বিধাতা গোড়াধিপের অদৃষ্টে সার্বভৌমের পদলাভ লেখেন নাই। স্থানীশ্বরের শূন্য-সিংহাসনে তদীয় অনুজ হর্ষ আরোহণ করিলেন। হর্ষ ভৃত্তিকে গোড়াধিপের গতিরোধার্থ নিয়োগ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানের জন্য বিক্রান্তরণ্যে প্রবেশ করিলেন। “হর্ষচরিতে” রাজ্যশ্রীর সহিত মিলন এবং তাঁহাকে লইয়া হর্ষের গন্ধাতীরস্থিত শিবিরে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন, হর্ষ রাজপদে বৃত্ত হইয়া মঞ্জীগণকে সোধান করিয়া বলিলেন,—“যতদিন আমার ভ্রাতার শত্রুগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে না পারিব এবং নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ বশীভূত করিতে না পারিব, ততদিন এই দক্ষিণ হস্তদ্বারা আহাৰ্য্য সামগ্ৰী তুলিয়া মুখে দিব না।” তাঁহার আদেশক্রমে স্থানীশ্বরে ৫০০০ হস্তী, ২০০০ অশ্বরোহী এবং ৫০০০০ পদাতি সংগৃহীত হইল।† এই সেনা লইয়া হর্ষবর্জন গোড়-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন,—“(হর্ষবর্জন) পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া, যে সকল রাজ্য তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, সেই সকল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং অবিরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া ছয় বৎসরের

† Beall's Records, Vol. I, p. 213.

মধ্যে ‘পঞ্চ-ভারতের’ (Five Indias) সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপর স্বরাজ্যের পরিসর বিস্তৃত করিয়া সেনাবল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ৬০০০০ হস্তী এবং ১০০০০০ অশ্বারোহী সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি অতঃপর আর অস্ত্রধারণ না করিয়া নির্বিব্রোধে ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।* ইউয়ান্ চোয়াংএর অত্যন্তম অনুবাদক টমাস্ ওয়াটাস্ লিখিয়াছেন, এই অংশে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এক রূপ পাঠানুযায়ী অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল। আর এক রূপ পাঠানুসারে অর্থ হয়,—হর্ষবর্দ্ধন ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়া, “পঞ্চ-ভারত’ স্বীয় বশবর্তী করিয়াছিলেন।” “পঞ্চ-ভারত” অর্থ যাহাই হউক, হর্ষবর্দ্ধন যে ছয় বৎসরকাল অবিরত যুদ্ধ করিয়াও গৌড়াধিপের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিক্তের শৈলোদ্ভব-বংশীয় মহাসামন্ত মাধবরাজের ৩০০ চলিত গৌণ্ডাকে [৬১৯ খৃষ্টাব্দে] সম্পাদিত তাম্রশাসনে “মহারাজাধিরাজ” শশাঙ্ক “চতুরদশি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবর্তী-বসুন্ধরার” অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।†

ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পরও যে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক শান্তিভোগে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন, তিনি কুশীনগর প্রদেশ হইতে বৌদ্ধ-প্রমগগণকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন; পাটলিপুত্রের বুদ্ধ-পদচিহ্নবিশিষ্ট প্রস্তর ভাস্কিয়া ফেলিতে এবং তাহাতে বিফলকাম হইয়া গঙ্গাগর্ভে ডুবাইয়া দিতে যত্ন করিয়াছিলেন; বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ উন্মূলিত এবং আশ্রমসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন; বোধিবৃক্ষের নিকট একটি বিহারে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ-মূর্তি ধ্বংস করিয়া শিবমূর্তি স্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। শশাঙ্ক যে কৰ্মচারীর উপর শেষোক্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি বুদ্ধ-মূর্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস না পাইয়া, মূর্তির সম্মুখে একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া, উহাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়া প্রাচীর গায়ে শিব-মূর্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইউয়ান্ চোয়াং

* “Proceedings eastwards he invaded the states which had refused allegiance, and waged incessant warfare until in six years he had fought the five Indias (reading *chi* according to the other reading *chen*, had brought the five Indias under allegiance). Then having enlarged his territory he increased his army, bringing the elephant corps up to 60,000 and the cavalry to 100,000, and reigned in peace for thirty years without raising a weapon.

Watters On Yuang Chwang's Travels in India 629-645 V. S. (London, 1904), Vol. I, p. 343.

† Epigraphia Indica, Vol. VI: p. 143.

লিখিয়াছেন—এই ঘটনার পর শশাঙ্ক আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে বহুসংখ্যক ক্ষত প্রকাশ পাইয়াছিল এবং শরীরের মাংস পচিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই রোগে কিছুদিন ক্লেশভোগ করিয়া অবশেষে গৌড়াধিপ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন—বৌদ্ধধর্মের বিলোপ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, শশাঙ্ক কুশীনগর প্রদেশে, বুদ্ধগয়ায় এবং পাটলিপুত্রে এই ধ্বংসলীলার আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু চীনদেশীয় শ্রমণের এই সিদ্ধান্ত যুক্তি-প্রমাণের সম্পূর্ণ বিরোধী। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে কিছু সাম্প্রদায়িক হিংসাদ্বেষ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি দ্বন্দ্বসমাস-প্রকরণে (পাণিনি ২।৪।১২) যাহাদের মধ্যে বিরোধ চিরন্তন [শাস্ত্রতিক] এইরূপ প্রাণীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত মধ্যে “শ্রমণব্রাহ্মণম্” উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণে বৌদ্ধধর্মের যে নিন্দা দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রাহ্মণ-যাজকের অন্তর্নিহিত শ্রমণ-বিদ্বেষ-প্রসূত। ব্রাহ্মণ হউক আর অব্রাহ্মণই হউক, সাধারণ শৈব বা বৈষ্ণবের মনে সেরূপ বিদ্বেষ ছিল না। এই জেণীর লোকেরা বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মকেও কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন, তাহা কেমেন্স-ব্যাঙ্গদাসকৃত “দশাবতার চরিতম্” কাব্যের “বুদ্ধাবতার” প্রসঙ্গে এবং জয়দেবের—

“নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ ! শ্রুতিজাতং

সদয় হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং

কেশব ধৃত-বুদ্ধ শরীর

জয় জগদীশ হরে।”

গাথায় প্রকটিত হইয়াছে।* শশাঙ্ক যে যুগে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগের

* খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দির শেষার্ধ্বে কেমেন্স কাম্বীরে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণকার বুদ্ধাবতার প্রসঙ্গে যেখানে লিখিয়াছেন, বিষ্ণু অসুরগণের সম্বোধনের জন্য বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেখানে বুদ্ধচরিতের সূচনায় কেমেন্স লিখিয়াছেন—

“কালে প্রয়াতে কলিবিম্বেন রাগগ্রহোদ্রে ভগবান্, ভবাকৌ

মন্ডত্ সু সংমোহ-জলে জনৈয়ু জগম্বি বাস করুণাকিতোহভুৎ ॥

স সর্ব-সন্তোষকৃতি-প্রযতঃ কৃপাকুলঃ শাক্যকুলে বিশালাৎ ॥

সুদ্বোদনাখ্যাত নরাধিপেন্দো ধর্ম্মস্ত গর্ভেহবততার পন্ত্যাঃ ॥

“অথ স ভগবান্, কৃত্বা সর্বে জগচ্ছিন-ভাস্কর

স্তিমির-রহিতং জ্ঞানালোকৈকঃ ক্রমাস্তুণি-বান্ধবঃ ॥

জন-করণয়া সজ্জর্মাখ্যং নিধায় পরং বপু-

স্তরণ-শরণং সংসারাক্ষা বভূৎ পুনরহ্যুতঃ ॥

শৈব এবং বৈষ্ণব নরপতিগণ বৌদ্ধ-দেবতা এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে রীতিমত ভক্তি করিতেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৬ খৃঃ অঃ) “পরম-ভাগবত” বা বৈষ্ণব ছিলেন। বসুবন্ধুর জীবনচরিতকার পরমার্থ লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি বৌদ্ধ-শ্রমণগণের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।† বলভীর মৈত্রক-বংশীয় “পরম-ভাগবত” প্রথম ধ্রুবসেন ২১৬ বলভী সম্রতে (৫৩৬ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত একখানি তান্ত্রশাসনের দ্বারা মাতাপিতার পূজা বৃদ্ধির এবং স্বকীয় ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্ত ডাগিনেয়ী পরমোপাসিকা দুর্ভা-কর্তৃক বলভী-নগরে প্রতিষ্ঠিত একটি বিহারে স্থাপিত বুদ্ধগণের পূজোপহারের এবং ভিক্ষুসংঘের সেবার জন্ত একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।* শশাঙ্কের প্রতিদ্বন্দী হর্ষ স্বীয় তান্ত্রশাসনে আপনাকে “পরম মাহেশ্বর” বা শৈব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অথচ ইউয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন, হর্ষ বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ-শ্রমণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যে দেশে, যে যুগে শৈব বা বৈষ্ণব-সাধারণের মনে বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষ স্থানলাভ করিতে পারিত না, সেই দেশের, সেই যুগের, শশাঙ্কের দ্বায একজন গৃহস্থ শৈবের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম-লোপের কল্পনা অসম্ভব।

দ্বিতীয় কারণ, ইউয়ান্ চোয়াং স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন, তৎকালে পুণ্ড্র-বর্জন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট এবং তান্ত্রলিপি, বাঙ্গালার এই চারিটি প্রধান নগরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধশ্রমণ এবং অনেক বৌদ্ধমঠ স্তূপ এবং বোধিসত্ত্ব-মন্দির বর্তমান ছিল। শশাঙ্ক এই সকল নগরের বৌদ্ধ-কৌত্তিকলাপের ধ্বংস-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ইউয়ান্ চোয়াং তাঁহার গ্রন্থে কোনও আভাস প্রদান করেন নাই। শ্রমণগণের নির্ঘাতন এবং বৌদ্ধ-মন্দিরাদির ধ্বংস সাধন করিয়া বৌদ্ধধর্মের মূলাৎপাটনই যদি শশাঙ্কের উদ্দেশ্য হইত তুতবে তিনি বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্গই তাহার সূচনা করিতেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধগণকে নিব্বিরোধে স্বধর্মানুষ্ঠান করিতে দিয়া, তিনি যখন মগধে ও মিথিলায় [কুশীন-নগর প্রদেশে] বৌদ্ধ-দলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন বুঝিতে হইবে—ইহার মূলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না,—স্বতন্ত্র কারণ বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধগয়া এবং কুশীনগর বৌদ্ধগণের প্রধান তীর্থস্থান। এই দুই স্থানের বৌদ্ধ-শ্রমণগণ বৌদ্ধ-সম্প্রদায় মধ্যে নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। শশাঙ্ক এবং হর্ষবর্দ্ধনের বিরোধ উপস্থিত হইলে, হর্ষ যখন মিথিলা এবং মগধ জয়ের চেষ্টা করিতে-ছিলেন তখন হযত বুদ্ধগয়া এবং কুশীনগরের শ্রমণগণ হর্ষবর্দ্ধনের অনুকূলে

† Smith's Early History of India, Second Edition, p. 292.

* Indian Antiquary, Vol. IV. (1815), pp. 104-107.

কোনও যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই অপরাধের দণ্ড দিবার জ্ঞায় শশাঙ্ক তাঁহাদের নির্যাতনে এবং বোধি-বৃক্ষাদি ধ্বংস করিয়া যড়যন্ত্রের কেন্দ্র বুদ্ধগয়ার মাহাত্ম্য-নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক জীবিত থাকিতে, হর্ষবর্দ্ধন যে মগধে স্ত্রীয় প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইবেন নাই, ইউয়ান্ চোয়াং প্রদত্ত শশাঙ্কের মৃত্যু বিবরণই তাহার প্রধান প্রমাণ।

গৌড়াধিপ শশাঙ্কের পরলোক গমনের পর, সহজেই তদীয় সাম্রাজ্য হর্ষ-বর্দ্ধনের পদানত হইয়াছিল। ইউয়ান্ চোয়াং বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তান্ত্রলিপি এবং কর্ণসুবর্ণের বিবরণে কোনও রাজার উল্লেখ করেন নাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট এবং তান্ত্রলিপির প্রাচীন রাজ-বংশ সম্ভবতঃ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল এবং কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্কের উত্তরাধিকারী হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষ-বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর, সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাঙ্গালার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। মগধের আদিভাসেন (৬৭১ খৃষ্টাব্দে) “মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়া অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তাঁহার আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিনা, বলা সুকঠিন। পরিত্রাজক ইংসিং লিখিয়া গিয়াছেন, সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে, সেক্চি নামক একজন পরিত্রাজক চীনদেশ হইতে জলপথে সমতটে বা বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। সেক্চি রাজভট নামক একজন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ-ম্পত্যিকে সমতটের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছিলেন।*

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় বড়ই দুর্দিনের সূত্রপাত হইয়াছিল। উত্তরাপথের ইতিহাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্তনের যুগ। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর, উত্তরাপথে সার্কভৌমতন্ত্র-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎপরিবর্তে বিভিন্ন প্রদেশে স্থিতিশীল স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক বিলম্ব ছিল। অবিরত রাজবিপ্লব এই যুগের প্রধান লক্ষণ। বাঙ্গালার ভাগ্যে এই বিপ্লব-জনিত ক্রেশের ভার অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়াছিল। বিহ্মা-প্রদেশের অধীশ্বর দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের [রঘোলিতে প্রাপ্ত] তান্ত্র-শাসন হইতে জানা যায়,—“শৈলবংশতিলক” স্রীবর্দ্ধন নামক নরপতির সৌবর্দ্ধন নামক পুত্র ছিল। এই সৌবর্দ্ধনের আবার তিন পুত্র হইয়াছিল।

“ভেবামুর্জিত-বৈরি বিদারণ-পটুং পৌণ্ড্রাধিপং স্মা-পতিং ।

হৈত্বে কো বিযয়ং তমেব সকলং জগ্রাহ শৌর্য্যায়িতঃ ॥”

* Beal's Life of Hiuen Tsiang (London 1888), p. XXX, Watters II. p. 188.

“ইহাদিগের মধ্যে শৌর্য্যাস্থিত একজন পরাক্রান্ত-শক্র-বিদারণ-পটু পৌণ্ড্র-ধিপকে নিহত করিয়া সমস্ত (পৌণ্ড্র) দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।”†

এই পৌণ্ড্র-বিজ্ঞতার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রপৌত্র দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধন রখোলিতে প্রাপ্ত শাসনের সম্পাদন-কর্তা। এই তাম্রশাসনের প্রকাশক শ্রীযুক্ত হীরালাল, অক্ষরের আকৃতির হিসাবে ইহাকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিতে চাহেন। সুতরাং দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের অনুল্লিখিতনামা প্রপিতামহের অনুল্লিখিত-নামা পৌণ্ড্রাধিপহস্তা অগ্রজকে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থাপন করা যাইতে পারে। এই পৌণ্ড্র জিৎ কোন দেশ হইতে আসিয়া পৌণ্ড্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বংশের নাম হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের কলিঙ্গের মহাসামন্ত মাধবরাজ “শৈলোত্তব”-বংশীয় ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্ণাত তাম্র-শাসন হইতে জানা যায়, সপ্তম শতাব্দে উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ “শৈলোত্তব-বংশীয় রাজগণের করতলগত ছিল। অজ্ঞাতনামা “শৈলবংশীয়” পৌণ্ড্র জিৎ “শৌলোত্তব-বংশের” শাখাস্তর হইতে সমুভূত বলিয়া অনুমান হয়। এই অভিনব পৌণ্ড্রাধিপের নামের মত, ইহার পরিণাম সম্বন্ধেও আমরা কিছুই জানি না।

পৌণ্ড্র দেশ যখন “শৈলবংশীয়” আক্রমণকারীর পদানত, তখন যশোবর্ধ্মা নামক একজন উচ্চাভিলাষী নরপাল কাণ্ডকুঞ্জের সিংহাসন লাভ করিয়া, হর্ষ-বর্দ্ধনের রাজধানীর পূর্ব-গৌরব পুনরুজ্জীবিত করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন। যশোবর্ধ্মার দিগ্বিজয়-কাহিনী তদীয় সভাকবি বাক্‌পতিরাজ কর্তৃক “গউড়বহো” নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।* চীনদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ধ্মা চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই সম্ভবতঃ যশোবর্ধ্মার “গউড়বহো”-বর্ণিত দিগ্বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল।

বাক্‌পতিরাজের কাব্যের “গউড়” বা গোড়পতি এবং “মগহনাহ” বা মগধ-নাথ অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ তৎকালে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবর্ত্তিত উত্তরাপথের পূর্বাংশের অধিপতি “গৌড়াধিপ”-উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বস্তুতঃ সপ্তম শতাব্দীর সূচনা হইতে [দ্বাদশ শতাব্দীর অবসানে] তুরুর-বিজয় পর্য্যন্ত গোড়মণ্ডলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন যেরূপই হউক, “গৌড়েশ্বর” বা “গোড়া-

† Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 44.

* “গউড় বহো”—এস. পি. পণ্ডিত সম্পাদিত। সঙ্গীক। Bombay Sanskrit Series, No. 34.

ধিপ” উপাধিধারী নরপতির অভাব কখনও উপস্থিত হয় নাই। যশোবর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী “গৌড়পতি” সম্ভবতঃ আদিত্যসেনের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত। বাক্‌পতি লিখিয়াছেন, কাশ্যকুঞ্জ হইতে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া, যশোবর্মা যখন বিক্রা-পর্বত অতিক্রম করিতেছিলেন তখন “তঁাহার ভয়ে, মদপ্রাবী গজের ললাট-নিঃসৃত জলের দ্বারা সম্মুখ-দেশ মায়া-নির্মিত নৈশ অঙ্ককারের মত অঙ্ককার করিয়া মগধ-নাথ পলায়ন করিলেন (৩৬৫ শ্লোক) ॥” কিন্তু মগধ-নাথের সামন্তগণ পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন না ; ফিরিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

“পলায়নপর মগধ-নাথের (সামন্ত)-নৃপতিগণ প্রত্যাবর্তন করিয়া, উদ্ধা-নির্গত অগ্নিকণা-সমূহের দ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন (৪১৪ শ্লোক) ॥

“সেই যুদ্ধের আরম্ভে (যশোবর্মার) শত্রু-সৈন্যের শোণিতের দ্বারা তাম্র-বর্ণে রঞ্জিত মহীতল মেঘ হইতে পতিত বিদ্যুল্লতার দ্বায় শোভা পাইতে লাগিল (৪১৫) ॥

“রাজা (যশোবর্মা) পলায়ন-পর মগধ-নাথকে নিহত করিয়া, দারুচিনির সুগন্ধে পরিপূর্ণ সমুদ্রতীর-বনে গমন করিয়াছিলেন (৪১৭) ॥”

মগধ-নাথ যেরূপ সমরানুরাগী সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, যশোবর্মার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তঁাহার “গৌড়ধিপ” উপাধি নিরর্থক ছিল না। কিন্তু বঙ্গপতি এই সামন্ত-চক্রের বহির্ভূত ছিলেন। বাক্‌পতি “মগধ-নাথের” দ্বায় বঙ্গপতির নামের উল্লেখ করেন নাই। তিনি এইমাত্র লিখিয়াছেন, যশোবর্মা মগধ-নাথকে নিহত করিয়া, সমুদ্রতীরস্থিত বঙ্গ-রাজ্যে উপনীত হইলে, অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বিজেতার পদানত হইয়াছিলেন।

যশোবর্মা বাহুবলে উত্তরাপথ-সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলেও, তঁাহার ভাগ্যে অধিকদিন সাম্রাজ্য-সম্ভোগ ঘটয়া উঠে নাই। গৌড়-বঙ্গ-বিজয়ের অনতিকাল পরেই, [৭৩৬ খৃষ্টাব্দের পরে] কাশ্মীরের অধিপতি ললিতাদিত্য-মুস্তাপীড় আসিয়া, তঁাহাকে কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন।* “রাজতরঙ্গিনী” এই ঘটনার চারিশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পরে [১১৫০ খৃষ্টাব্দে] সম্পূর্ণ হইয়াছিল, † এবং কহলুপ সম্ভবতঃ জনশ্রুতি অবলম্বনেই ললিতাদিত্যের কাশ্যকুঞ্জ-বিজয়-কাহিনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ভাবে এই কাহিনীর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,

* এম, এ, স্কিন অনুদিত “রাজতরঙ্গিনীর” ভূমিকা ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

† “অশ্বিনীয়াং স্তং নিঃশেষা দণ্ডনো গৌড়মণ্ডলাং ॥ (৪১৪৮) ॥”

তাহা পর্যালোচনা করিলে, ইহাকে ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে সাহস হয় না। কহলণ লিখিয়াছেন, ললিতাদিত্য-মুক্তাপীড় “কবি বাক্পতিরাজ-শ্রীভবভূতি-আদি-সেবিত” যশোবর্ধাকে বশীভূত করিয়া, কলিঙ্গ অভিযুখে যাত্রা করিলেন। তখন গোড়মণ্ডল হইতে অসংখ্য হস্তী আসিয়া তাঁহার (সেনার) সহিত মিলিত হইল।”

॥ গোড় ও কাশ্মীর ॥

গোড়ের মহাসামন্ত যেন কাম্বুকুজ-বিজয়ী ললিতাদিত্যকে করস্বরূপ এই সকল হস্তী প্রদান করিলেন। কহলণ-বর্ণিত ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ-বিজয়-কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হইতে পারে। যশোবর্ধার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গোড়ীয় মহাসামন্তকেও সম্ভবতঃ ললিতাদিত্যের পদানত হইতে হইয়াছিল; এবং নবীন সম্রাটের মনস্তত্ত্বের জগু হস্তী উপঢৌকন দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে বোধ হয়, ললিতাদিত্যের আজ্ঞানুসারে গোড়পতিকে কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। ললিতাদিত্য স্বনির্মিত পরিহাসপুর [বর্তমান পরসপুরীড়ার] নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত “পরিহাস-কেশব” নামক নারায়ণ-মূর্ত্তিকে মধ্যস্থ-[জামিন] রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি গোড়পতির গাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তথাপি কোন কারণ বশতঃ ঘটুক নিযুক্ত করিয়া, পরিহাসপুরের অনতিদূরস্থিত ত্রিগ্রাম নামক স্থানে গোড়রাজের বধ সাধন করাইয়াছিলেন। এই সংবাদ যখন গোড়ে পৌঁছছিল তখন গোড়পতির একদল ভৃত্য এট নৃশংসতার প্রতিশোধ লইবার জগু, শারদাতীর্থ-দর্শনে যাইবার ভাণ করিয়া কাশ্মীর প্রবেশ করিলেন; এবং পরিহাস-কেশবের মন্দির অবরোধ করিলেন। পূজকগণ তখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। গোড়-যোদ্ধগণ প্রবল পরাক্রমের সহিত মন্দির আক্রমণ করিয়া, রামস্বামী নামক রজত-নির্মিত আর একখানি নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন এবং পরিহাস-কেশব-ভ্রমে তাহা ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিলেন। ইতিমধ্যে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে সৈন্য আসিয়া, তাঁহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইল। গোড়ীয়গণ যখন রামস্বামীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে বিব্রত তখন কাশ্মীর-সৈন্য তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিকে দৃকপাৎ না করিয়া গোড়ীয়গণ মূর্ত্তি-ধ্বংসে নিবিষ্ট রহিলেন; এবং একে একে সকলেই শত্রুর তরবারির আঘাতে নিহত হইলেন। কহলণ লিখিয়াছেন, “দীর্ঘকালে লজ্জনীয় গোড় হইতে কাশ্মীরের পথে কখাই বা কি

বলিব, এবং মৃত প্রভুর প্রতি ভক্তির কথাই বা কি বলিব? গৌড়গণ তখন যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিধাতার পক্ষেও তাহা সম্পাদন করা অসাধ্য!..... অত্যাপি রামস্বামীর মন্দির শূণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং গৌড়-বীরগণের যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ।”*

প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই কহলুণ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং ইহাকে অমূলক মনে করিবার কারণ নাই। কহলুণ ললিতাদিত্যের অশেষ গুণগ্রামের এবং কীর্তি-কলাপের বর্ণনা করিয়াও, তাঁহার দুইটি মাত্র দুষ্কার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দুষ্কার্য, সুরাপান-জনিত মত্ততা-বশে ললিতাদিত্য এক সময় প্রবরপুর (শ্রীনগর) দগ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দুষ্কার্য, গৌড়পতি-বধ। অমূলক হইলে অপ্রাকৃতের সম্পর্ক-বর্জিত এই দুইটি ঘটনা, বিশেষতঃ বিদেশীর মাহাত্ম্য-সূচক গৌড়বধ-বৃত্তান্ত, চারিশত বৎসরকাল জনসাধারণের স্মৃতিপথাক্রম থাকিত না। ললিতাদিত্য বা তাঁহার সেনা যে এক সময় গৌড়-সীমান্তে অবস্থিত মগধ পর্য্যন্ত পঁছরিয়াছিল, কহলুণ দিগ্বিজয়-বিবরণে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও প্রসঙ্গান্তরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ললিতাদিত্যের মন্ত্রী চক্ৰুণ ললিতাদিত্যকে একস্থলে বলিতেছেন, “মগধদেশ হইতে যে বুদ্ধমুর্তি গজ-স্কন্ধে করিয়া আনা হইয়াছে, তাহা প্রদান করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন।”† অবাস্তর প্রসঙ্গে উল্লিখিত মগধ হইতে এই বুদ্ধমুর্তি আনয়ন-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় না; এইস্থানেই গৌড়পতির সহিত ললিতাদিত্যের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে।

যশোবর্মার সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ের সহিত কাণ্ডকুঞ্জের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সুযোগে, এবং গৌড়াধিপ কাশ্মীরে নিহত হইবার পর, ভগদত্ত বংশীয় হর্ষদেব, গৌড়মণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া এক বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। নেপালের রাজা জয়দেব-পরচক্রকামের ১৫৩ হর্ষ-সম্বতের [৭৫৮ খৃষ্টাব্দের] শিলালিপিতে এই হর্ষদেবের পরিচয়

* ক দীর্ঘকাল-লজ্জাবোধী শাস্ত্রে ভক্তি: ক চ প্রভৌ।

বিধাতুরশাস:ধ্যং তদঙ্গর্গোটেড় বিহিতং তদা ॥

.

অত্যাপি দৃশ্যতে শূণ্যং রামস্বামি-পুরাস্পদং।”

ত্রয়োং গৌড়-বীরশাং সনাং বশাং পুনঃ ॥ (৪১৩৩২-৫)

† “গজস্কন্ধে ধিবোপৈত্যতঙ্গাগধেভো। যদাজতং।

দদ্বা সূগত-বিধং তস্কনীরবনুগৃহতাম্ ॥” (৪১২৫২)

পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, জয়দেব ভগদত্ত-বংশীয় “গৌড়োদ্ভাদিকলিঙ্গ-কোশল-পতি” হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।† বাণভট্টের “হর্ষচরিত” এবং আসাম প্রদেশে প্রাপ্ত তাম্র-শাসন-নিচয় হইতে জানা যায়, প্রাচীন কামরূপের নৃপতিগণ নরক এবং ভগদত্তের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। হর্ষদেব সম্ভবতঃ কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ-সমৃদ্ধ ছিলেন; এবং কামরূপ ত্যাগ করিয়া কামরূপের পূর্ব-সীমান্ত করতোয়া নদী পার হইয়া গোড়ে আসিয়া, যশোবর্মার সাম্রাজ্যের অধঃপতন-জনিত উত্তরাপথব্যাপী বিপ্লবের সময়, গোড়, উৎকল, কলিঙ্গ এবং দক্ষিণ কোশল লইয়া, এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন।

রাজতরঙ্গিনীতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থপাদের আরম্ভে বাঙ্গালায় আর একটি অভিনব রাজবংশ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কহলপ লিখিয়াছেন, ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই* বৃহৎ একদল সেনা লইয়া পিতামহের শ্মশান দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। জয়াপীড় কাশ্মীর হইতে সরিয়া গেলে, তদীয় শ্যালক জঙ্ক বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপর সৈন্যগণও জয়াপীড়কে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। তখন তিনি সঙ্গী সামন্তরাজগণকে বিদায় দিয়া, অল্প কিছু সৈন্য লইয়া প্রয়াগ গমন করিয়া-ছিলেন; এবং তথা হইতে একাকী ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তখন “গৌড়রাজ্যান্ত্রিত” এবং জয়ন্ত-নামক সামন্ত নৃপতির রক্ষণাধীনে ছিল।† জয়াপীড় “সৌরাজ্য” (সুশাসিত) এবং “পৌরবিভূতি”-ভূষিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এক নর্তকীর গৃহে আশ্রয় লইলেন; এবং একটি সিংহ-হত্যা করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন রাজা জয়ন্ত জয়াপীড়ের সহিত স্বীয় দুহিতা কল্যাণদেবীর বিবাহ দিলেন। “জয়াপীড় বিনা আয়োজনে গোড়ের পাঁচজন নরপালকে পরাজিত করিয়া, স্বস্তরকে গোড়াধীশের আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিয়া-

† Indian Antiquary, Vol. IX, p. 178.

* কহলপের মতানুসারে ৭৫১ খৃষ্টাব্দে জয়াপীড়ের রাজ্য লাভ নিৰ্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু ঠিক দেখাইয়াছেন, ইহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে জয়াপীড় প্রকৃত প্রস্তাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

† “গৌড়রাজ্যান্ত্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাত্মনং ভুভুজা।

প্রবিশেষ ক্রমেপাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনং ॥ (৪।৪২১)।”

ছিলেন।”‡ যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দুর্ঘট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিম্বা জয়পীড়ের অজ্ঞাতবাস-উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন। §

ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত আশরফপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসনে সম্ভবতঃ বঙ্গের এই যুগের রাজকীয় ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দুইখানি তাম্রশাসনে এক অভিনব রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।* সুগতে, তদীয় সংঘে, এবং তদীয় ধর্মে দৃঢ়ভক্তিমান “সমগ্র পৃথিবী বিজেতা [ক্ষিত্রিয়মভিতোনির্জিতা]” শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। খড়্গোদ্যমের উত্তরাধিকারী [তদীয় পুত্র] “ক্ষিত্রিপতি” জাতখড়্গ। জাতখড়্গে সম্বন্ধে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন,—“বামু যেমন তুণকে

‡ “ব্যথাষিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।

পঞ্চ গোড়াংপাল্লিঙ্গা শস্তুরং তদবীশ্বরম্ ॥ (৪৪৩৫) ॥”

§ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় “ব্রাহ্মণ-কাণ্ড” নামক গ্রন্থের প্রথমংশে কল্পগোক্ত “জয়ন্ত” এবং কুলপঞ্জিকা-সমূহে উল্লিখিত পঞ্চব্রাহ্মণ-অনয়নকারী “আদিশুর”কে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি—“ধর্মপালের পূর্বে এখানে জয়ন্ত ব্যতীত আর কোনও হিন্দু রাজাকে ঐরূপ উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত দেখি না। ইত্যাদি কারণে সহজেই বোধ হইতেছে, গোড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা কব্জিক পঞ্চগোড়ের অধীশ্বর হইলে, “আদিশুর” উপাধি গ্রহণ করেন (১০১ পৃ)।” কুলপঞ্জিকার আদিশুর ভিন্ন “পঞ্চগোড়াধিপ” উপাধিধারী বাদ্দালার আর কোন স্বাধীন হিন্দু রাজার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং তৎকালীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, বাদ্দালার স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণ “গোড়াধিপ” বা গোড়েশ্বর” উপাধি লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন। আর কল্পগোড় বা জয়ন্তকে “পঞ্চগোড়াধিপ” বলিলেন কোথায়? কল্পগ বহুবচনান্ত “পঞ্চগোড়াধিপাম্” [গোড়ের পাঁচজন নৃপতির] উল্লেখ করিয়াছেন; একবচনান্ত “পঞ্চগোড়াধিপম্” লিখিয়া যান নাই। উক্ত গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠার ২নং টীকায় বসু মহাশয় ব্রাহ্মণডাল্লা নিবাসী “বংশীবিন্দ্যারত্ন ঘটকের সংগ্রহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—“ভৃশুরেণ চ রাজাপি শ্রীজয়ন্ত সূতেন চ। দ্বারাপি দেশভেদৈস্ত রাষ্ট্রা বারেন্দ্র সাংসতী।” এই টীকার টীকায় আবার লিখিয়াছেন, “আদিশুর সূতেন চ।” এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।” অন্য কোন পুস্তকে এই পাঠান্তর লক্ষিত হয় না একই পুস্তকের টীকায় পাঠান্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে বসু মহাশয় কিছুই বলেন নাই। জয়ন্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে, ১১০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। আর “বংশীবিন্দ্যারত্নঘটক উনবিংশ শতাব্দীর লোক। বংশীবিন্দ্যারত্ন কোন মূলগ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্যই বা কত, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক বিচার না করিয়া এত বড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না।

এবং করী যেমন অশ্ববৃন্দকে বিধ্বস্ত করে, তিনিও সেইরূপ স্ত্রীয় শৌর্য্য-প্রভাব সমস্ত শত্রুকুল বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।” জাতখড়োর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী “অশেষক্ষিতিপাল-মৌলিমালা-মণিদ্যোতিত-পাদপীঠ,” “নির্জিত শত্রু” শ্রীদেবখড়া। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে দেবখড়োর পুত্র রাজরাজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই রাজবংশ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু ইএযাবৎ জানা যায় নাই।

॥ গোড়ে বৎসরাজ ॥

যশোবর্মা কর্তৃক “গোড়বধ” হইতে গোড়মণ্ডলের অপরাপর অংশে ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতে থাকিলেও, খড়া-রাজগণের শাসনাধীনে বঙ্গ সম্ভবতঃ শান্তি-লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ৭৮৪ খৃষ্টাব্দের পরে আর এক বহিঃশত্রু বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, বঙ্গের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল এবং গোড়ের বিপ্লবানল প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালার এই নবাগত অতিথি গুর্জরের (বর্তমান রাজপুতনার) প্রতীহার-বংশীয় রাজা বৎসরাজ। জিনসেন প্রণীত জৈন-হরিবংশের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে—

“শাকেশ্বরশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেম্বুত্তরাং
পাতীংদ্রায়ুধনায়ি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং ।
পূর্বাং শ্রীমদবন্তিভূত্বি নৃপে বৎসরাজে পরাং
সৌর্য্যগামধিমংডলং জয়যুতে বীরে বরাহেবতি ॥”

“৭০৫ শাক (৭৮০-৭৮৪ খৃষ্টাব্দে) যখন ইন্দ্রায়ুধ নামক (রাজা) উত্তর-দিক পালন করিতেছিলেন ; কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ (রাষ্ট্রকূটরাজ ঋব) দক্ষিণদিক পালন করিতেছিলেন ; যখন পূর্বদিক শ্রীমান্ অবন্তিরাজের শাসনাধীনে, অপর (পশ্চিম) দিক বৎসরাজ (নামক) নৃপতির শাসনাধীনে ; এবং সৌর্য্যগণের রাজ্য বীর জয়বরাহের শাসনাধীনে ছিল ।”*

এই পশ্চিম-দিকপাল বৎসরাজ অবন্তি (মালব)-রাজকে পরাজিত, এবং বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, গোড়পতি এবং বঙ্গপতি উভয়কেই পরাভূত করিয়া-ছিলেন ; এবং উভয়ের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যশোবর্মার দ্বায় বৎসরাজকেও শত্রুর তাড়নায়, অচিরকাল মধ্যেই গোড়বঙ্গ-বিজয়-ফল সম্ভোগে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট-রাজ ঋব বৎসরাজকে নবজিত প্রদেশ-নিচয় ত্যাগ করিয়া, রাজপুতনার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়া-

* Indian Antiquary, XV, p. 141 ; Journal of the Royal Asiatic Society (1909), p. 253.

ছিলেন। ঋব ৭৭৫ হইতে ৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঋবের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ বৎসরাজকে দমন রাখিবার জন্য, অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের [দক্ষিণ গুজরাতের] “মহাসামন্ত-ধিপতি” পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের ওয়ানি এবং রাধন-পুরের তান্ত্রশাসনে বৎসরাজের গৌড়বঙ্গ-বিজয় এইরূপে সূচিত হইয়াছে,— “তিনি (ঋব) অতুল-পরাক্রম সেনাবলের দ্বারা হেলায় গৌড়রাজ্য জয়-জনিত অহঙ্কারে মত্ত বৎসরাজকে অচিরাৎ দুর্গম মরুমধ্যে তাড়িত করিয়া, কেবল যে (তাঁহার) গৌড়জয়লক্ষ শরদিন্দু-ধবল ছত্রয়ই কাড়িয়া লইয়াছিলেন এমন নহে; তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিগন্তব্যাপী যশও কাড়িয়া লইয়াছিলেন।”† ইন্দ্র-রাজের পুত্র কর্করাজের ৭৩৪ শকের (৮১২ খৃষ্টাব্দের) বরোদায় প্রাপ্ত তান্ত্র-শাসনে এই ঘটনা আরও স্মৃতিভর হইয়াছে। এই তান্ত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,— “প্রভু (তৃতীয় গোবিন্দ) পরাজিত, মালবরাজকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার (কর্করাজের) এক হস্তকে, গোড়েন্দ্র এবং বঙ্গপতিবিজেতা, দুর্শামন্ত গুর্জরপতির আক্রমণার্থ আগমন-পথের সুদৃঢ় অর্গলে পরিণত করিয়া, অপর হস্তকে রাজ্যফলস্বরূপ উপভোগ করেন।”* এই “গুর্জরপতি”ও অবশ্যই বৎসরাজ। কারণ, ঋব কর্তৃক গুজরাত ও মালবে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্য স্থাপিত হইলে, আর কোনও গুর্জরপতির পুনর্ব্বার গৌড়বঙ্গবিজয়ের অবসর পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কর্করাজের এই তান্ত্রশাসন প্রমাণ করিতেছে, বৎসরাজ ৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

॥ মাৎসর্য্যার—গোপাল ॥

“শৈলবংশীয় গৌড়পতির অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরাজের আক্রমণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণের এবং রাজবিপ্লবের ফলে, গৌড়-মণ্ডলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা

† “হেলা-স্বীকৃত-গৌড়রাজ্যকললামন্তঃ প্রবেশ্যাচিরা-

দূর্মাণং মরুমধ্যমপ্রতিবলৈধো বৎসরাজং বলৈঃ।

গৌড়ীয়ং শরদিন্দুশাধবলং ছত্রয়ং কেবলং

তন্মাত্রাহত তদ্বশোপি ককুভাং প্রাপ্তে হিতং তৎক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥”

Indian Antiquary, Vol. XII, pp. 156-165.

* গোড়েন্দ্রবঙ্গপতি-নির্ধর-দুর্কিবন্ধ-সন-গুর্জরেশ্বর-দিগর্গলতাং চ যত্র।

নীদ্বা ভূজং বিহতমালবরক্ষার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্য-কলানি ভুংক্তে ॥”

Indian Antiquary, Vol. XI, p. 157; Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 242.

সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কার্যাত দেশে রাজশাসন ছিল না। সুযোগ পাইয়া, সবল হৃৎগণ অবশ্যই দুর্বল প্রতিবেশীর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ের গৌড়মণ্ডলের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন—“উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যদেশের আর পাঁচটি প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈশ্য পার্শ্ববর্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধিকার স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিল না।” * সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ অরাজক-অবস্থাকেই “মাৎস্য-শাস্ত্র” কহে। এই “মাৎস্যশাস্ত্রের” ফলে গৌড়মণ্ডলে পালরাজ্যের অভ্যুদয়।

“মাৎস্য-শাস্ত্র দূর করিবার অভিপ্রায়ে, জনসাধারণ [প্রকৃতিভিঃ] বপাটনয়ন গোপালকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিলেন;”—গোপালের পুত্র ধর্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে গোপালের রাজপদ-লাভের এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তারনাথও এই নির্বাচনের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং গোপাল প্রথমে বাঙ্গালা দেশে রাজপদে নির্বাচিত হইয়া পরে মগধ বশীভূত করিয়াছিলেন, এইরূপও লিখিয়া গিয়াছেন।† গৌড়-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্ক বাঙ্গালী ছিলেন; এবং তারনাথের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, মনে করিতে হয়—বাঙ্গালার জনসাধারণ কর্তৃকই [অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গোপালের নির্বাচনসূত্রে] “মাৎস্য-শাস্ত্র” বিদূরিত এবং গৌড়রাজ্য পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। যদিও তারনাথ গোপালের নির্বাচনের আট শতাব্দীরও অধিককাল পরে [১৬০৮ খৃষ্টাব্দে] মগধের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার এই বিবরণ যে অমূলক নহে, সমসাময়িক লিপিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা ধর্মপালের প্রসঙ্গে দেখিতে পাইব, প্রতীহার-রাজ ভোজের সাগর-তালের শিলা-লিপিতে ধর্মপালকে “বঙ্গপতি” এবং তাঁহার সেনাগণকে “বাঙ্গালী” [বঙ্গাব্]]

* “In Odivisa, in Bengal, and the other five provinces of the east, each Kshatriya Brahman and merchant constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the country.”—Indian Antiquary, Vol. IV, pp. 365-366

† “The writer tells how the wife of one of the late kings by night assassinated every one of those who had been chosen to be kings, but after a certain number of years Gopala, who had been elected for a time, delivered himself from her and was made king for life. He began to reign in Bengal, but afterwards reduced Magadha also under his power. He built the Nalandara temple not far from Otantapur, and reigned forty-five years.”—Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

বলা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশকে পালরাজগণের আদি-নিবাস না ধরিয়া লইলে এইরূপ উল্লেখ নিরর্থক হয়।

খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে গোপালের পিতামহ “সর্ববিদ্যাবিদ” [সর্ববিদ্যাবিদাত] এবং তাঁহার পিতা বপাট “খণ্ডিতারাতি” (জিতশত্রু) এবং কীর্তিকলাপ দ্বারা সমাগরা-ধরা-মণ্ডনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয়,—বপাট সমৃদ্ধ এবং সমর-কুশল ছিলেন। গোপাল রাজ-পদে নির্বাচিত হইয়াই, সম্ভবত গোড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিতে যত্ববান হইয়া ছিলেন; এবং গুর্জরপতি বৎসরাজ [৭৮৪ হইতে ৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে] যখন রাষ্ট্রকূট-রাজ ঋব কর্তৃক রাজপুতনার মরুভূমিতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তখন স্থায় উদ্দেশ্য সাধনের অবসর লাভ করিয়াছিলেন। দেব-পালের [মুঙ্গেরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—গোপাল সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন; এবং তারনাথ লিখিয়াছেন,—গোপাল মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। হয়ত মিথিলা বা তীরভুক্তি [= ত্রিহৃত]-ও তাঁহার পদানত হইয়াছিল। তীরভুক্তি যে পাল-নরপালগণের অধিকারভুক্ত ছিল, নারায়ণপালের [ভাগলপুরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসন তাহার সাক্ষাদান করিতেছে; অথচ কখন যে তীরভুক্তি অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা কোনও তাম্র-শাসনে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং গোপালই তীরভুক্তি অধিকার করিয়া-ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

॥ ধর্মপাল ॥

গোপাল গোড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় উত্তরাধিকারী ধর্মপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, গোড়াধিপ শশাঙ্কের দ্বায় উত্তরাপথের সার্বভৌমের পদলাভের জন্ম যত্ববান হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক যেখানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন, ধর্মপাল সেখানে কৃতকার্য হইলেন। ধর্মপালের [খালিমপুরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—“তিনি [ধর্মপাল] মনোহর জডঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিতমাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মজ্জ, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রশংসিত-পরায়ণ চঞ্চলাবনত মন্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্ট-চিত্ত পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া, কাম্বুকুঞ্জরাজকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।” এই ঘটনাটি নারায়ণপালের [ভাগলপুরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে আরও সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যথা—“ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া পরাক্রান্ত [ধর্মপাল] মহোদয়ের

[কাশ্যকুঞ্জের] রাজশ্রী উপার্জন করিয়াছিলেন ; এবং পুনরায় উহা প্রণত এবং প্রার্থী চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন।” পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—এই ইন্দ্র-রাজই জৈন-হরিবংশে উল্লিখিত উত্তর-দিকপাল ইন্দ্রায়ুধ। গুর্জর এবং মালবের বহির্ভাগে অবস্থিত, গান্ধার [পেশোয়ার প্রদেশ] হইতে মিথিলার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত উত্তরাপথ ইন্দ্রায়ুধের করতলগত ছিল। ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধ এবং তাঁহার সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া উত্তরাপথের সার্বভৌমের সমুদ্রত পদ লাভ করিয়াছিলেন। এত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্বয়ং শাসন করিতে সমর্থ হইবেন না মনে করিয়া, তিনি আয়ুধ-রাজবংশীয় আর একজনকে [চক্রায়ুধকে] স্বকীয় মহাসামন্তরূপে কাশ্যকুঞ্জে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তারনাথ পালরাজ্যের যে বংশতালিকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু প্রমাদপূর্ণ। তারনাথ ধর্মপালকে গোপালের প্রপৌত্র, দেবপালের পৌত্র, এবং রসপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু ধর্মপালের সাম্রাজ্যের যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে তাম্রশাসনের প্রমাণের অনুযায়ী। তারনাথ লিখিয়াছেন, “ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ, তিরছতি, গোড় প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার রাজ্য পূর্বদিকে সমুদ্র হইতে পশ্চিমে তিলি (দিল্লি ?) পর্য্যন্ত এবং উত্তরে জলন্ধর হইতে দক্ষিণে বিক্রাপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সময়ে রাজ্য চক্রায়ুধ পশ্চিমদিকে রাজত্ব করিতেন।”*

কোন সময়ে যে ধর্মপাল পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া উত্তরাপথের সার্বভৌম হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, অমোঘবর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে—

“স্বয়মেবোপনতো চ যস্য মহতস্তৌ ধর্মচক্রায়ুধৌ ॥”†

“ধর্ম [পাল] এবং চক্রায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া (গোবিন্দের নিকট) নতশির হইয়াছিলেন।” ধর্মপাল প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশির হইয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই পংক্তিটি প্রমাণ করিতেছে, রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে, ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে ৮১৩

* Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

† Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 1906, p. 116.

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। অনেকে মনে করেন, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২১০ বৎসর পূর্বে তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন এবং অমোঘবর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হাঁহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাঁহার রাজ্যাভিমেককাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিককাল-ব্যাপী রাজত্ব কল্পনা অসম্ভব। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইয়া, ইহার ২১১ বৎসর পূর্বে [৮১৫ কি ৮১৬ খৃষ্টাব্দে] ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত এবং চক্রায়ুধকে কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং ঐ ঘটনার অব্যবহিত পূর্বেই পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

৮১৭ খৃষ্টাব্দের এত অল্পকাল পূর্বে, ধর্মপালের রাজ্যলাভ অনুমানের কারণ, ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মুক্কেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে— ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট-তিলক শ্রীপরবলের দুহিতা রমাদেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যভারতের অন্তর্গত পথরি নামক করদ-রাজ্যের প্রধান নগর পথরিতে অবস্থিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভ-গাড়ে উৎকীর্ণলিপি হইতে জানা যায় ;— রাষ্ট্রকূট পরবলের রাজত্বকালে [সম্বৎ ৯১৭ বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দে] পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত এই স্তম্ভ-লিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট-বংশীয় পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তম্ভ-লিপির পরবলই ধর্মপালের পত্নী রমাদেবীর পিতা। এই অনুমানই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ধর্মপাল দীর্ঘকাল সিংহাসনে আরুঢ় ছিলেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন তাঁহার “অভিবর্জমান বিজয়-রাজ্যের ৩২ সম্বতে” সম্পাদিত হইয়াছিল ; এবং তারনাথ লিখিয়াছেন, ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৮১৫ সালে রাজ্যের আরম্ভ ধরিলে, তারনাথের মতানুসারে, ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ধর্মপালের রাজত্বের অবসান মনে করিতে হয়। খালিমপুরের শাসনোক্ত ৩২ বৎসর এবং জনশ্রুতির ৬৪ বৎসরের মধ্যে ধর্মপাল অন্যান্য ৫০ বৎসর বা ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, [৮৬১ খৃষ্টাব্দে] পথরির লিপি সম্পাদনকালে পরবল যে বার্কো উপনীত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় জেঞ্জ নামক নরপতির অগ্রজ অসংখ্য কর্ণাটসৈন্য পরাজিত

করিয়া লাটাখা রাষ্ট্র অধিকার করিয়াছিলেন। জেজের পুত্র কর্করাজ নাগাবলোক নামক নরপালকে পরাজিত এবং তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ধ্বংসবিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। পরবল এই কর্করাজের পুত্র। ডাক্তার কিল্‌হর্ন পথরি-সন্তুলিপির ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি ভৃগুক্কে ৮১৩ সম্বতে [৭৫৬ খৃষ্টাব্দে] শ্রীনাগাবলোকের বিজয়রাজ্যে জৈনক চাহমান মহাসামন্তাধিপতি-সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন যদি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং পথরি-সন্তুলিপির নাগাবলোক এবং এই শাসনোক্ত নাগাবলোক যদি একই ব্যক্তি হয়, তবে কর্করাজ এবং তদীয় পুত্র পরবলকে ৭৫৬ হইতে ৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। আমাদের কাছে এখন যে কিছু প্রমাণ উপস্থিত, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, ইহা ভিন্ন অশু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; এবং নাগাবলোকের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্করাজের পুত্র পরবল [৮৬১ খৃষ্টাব্দে] দীর্ঘকালবাণী রাজত্বের পর বার্ককো উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং পরবল এবং ধর্মপাল প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন এবং ধর্মপাল কর্তৃক পরবলের কস্তার পাণিগ্রহণ অসম্ভব বোধ হয় না। ধর্মপাল সম্ভবতঃ প্রৌঢ়বয়স্ক রম্মাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মপাল ও রম্মাদেবীর পুত্র দেবপালও দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের [মুঙ্গের প্রাপ্ত] তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বের ৩৩ বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল; এবং তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, দেবপাল ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যৌবনে রাজ্যালাভ না করিলে, দেবপালদেবের পক্ষে এত দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ ঘটয়া উঠিত না। ধর্মপালের মৃত্যুসময়ে দেবপালদেব যুবক ছিলেন, এই কথা স্বীকার করিলে, পরবলের প্রথম যৌবনে জাত দুহিতা রম্মাদেবীকে ধর্মপাল প্রৌঢ়বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রকূট পরবলের পক্ষে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, ধর্মপালের শায় পরাক্রমশালী নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রকূট-মহাসামন্তাধিপতি কর্করাজ সুবর্ণবর্ষের [বরোদায় প্রাপ্ত] ৭৩৪ শকাব্দের [৮১২ খৃষ্টাব্দের] তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,—রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ, কর্করাজের পিতা ইন্দ্ররাজকে “লাট”-মণ্ডলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই নিমিত্তই হয়ত রাষ্ট্রকূট-পরবলকে লাট (গুজরাত) ত্যাগ করিয়া পথরি-প্রদেশে সরিয়া আসিতে হইয়াছিল। গুর্জরের উচ্চাভিলাষী প্রতীহার-রাজগণ এখানে হয়ত পরবলকে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতীহার-রাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, পরবলের আত্মরক্ষার

উপায়াস্তর ছিল না। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই পরবল রণাদেবীকে ধর্মপালের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

॥ ধর্মপাল ও নাগভট ॥

ধর্মপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেই, গুর্জরের অধীশ্বর বৎসরাজ পরলোক গমন করিয়াছিলেন; এবং তদীয় পুত্র দ্বিতীয় নাগভট [নাগভট] গুর্জর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। যোধপুর-রাজ্যের অন্তর্গত বুচকলা নামক স্থানে প্রাপ্ত ৮৭২ সন্বতের [৮১৫ খৃষ্টাব্দের] একখানি শিলালিপিতে * “মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবৎসরাজদেব-পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীনাগভট্টদেবের প্রবর্দ্ধমান-রাজ্যের” উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নাগভট্ট পিতৃরাজ্যের স্থায় উত্তরাধিকারিসূত্রে পিতার উচ্চাভিলাষও লাভ করিয়াছিলেন। সূতরাং ধর্মপাল ও নাগভট্টের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। পাল-রাজগণের তান্ত্রশাসনে পাল-প্রতীহার-মুদ্রের কোনও বিবরণ পরিরক্ষিত হয় নাই। নাগভট্টের পৌত্র মিহিরভোজের [গোয়ালিয়ের প্রাপ্ত] শিলালিপিতে নাগভট্টের কীর্তিকলাপের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—†

“আদ্যঃ পুমান্ পুনরপি স্মৃটকীর্তিরস্মা-

জ্জাতসূস এব কিল নাগভট্টস্তদাখ্যঃ।

যত্রাজ্ঞ-সৈন্ধব-বিদর্ভ-কলিঙ্গ-ভূপৈঃ

কৌমার-ধামনি পতঙ্গ-সমৈরপাতি ॥

ত্রয্যাস্পদস্য সূকৃতস্য সমৃদ্ধিমিচ্ছু-

র্যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ।

জিত্বা পরাশ্রয়কৃত-স্মৃটনীচভাবং

চক্রায়ুধং বিনয়নস্ত-বপুবর্বারাজং ॥

দুর্কার-বৈরি (?) বরবারণ-বাজ্জিবার-

যাশৌষ-সংঘটন-ঘোর-ঘনাজ্জকারং।

নির্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূষিবস্মা-

নুদ্যল্লিব ত্রিঙ্গদেক-বিকাসকো যঃ ॥

আনর্ভ=মালব-কিরাত তুরুঙ্গ-বৎস

মৎস্যাদিরাজ-গিরিদুর্গ-হঠাপহারৈঃ।

যস্মাস্ম-বৈভবমতীন্দ্রিয়মাকুমার-

মাবিবর্ভুব ভুবি বিশ্বজনীন-বৃত্তেঃ ॥” (৮—১১ শ্লোক)

* Epigraphia Indica, Vol. IX, pp. 198—200.

† Archaeological Survey of India, Annual Report, 1903—4, p. 281.

“আদিপুরুষ (বিষ্ণু) পুনরায় বৎসরাজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিখ্যাত-কীর্তি এবং গজসেনাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া সেই [নাগভট] নামধারী হইয়াছিলেন। (তঁাহার) কৌমার-কালের প্রঙ্কলিত প্রতাপবহিতে অঙ্ক, সৈন্য, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের ভূপতিগণ পতঙ্গের মত পতিত হইয়াছিলেন।

“বেদোক্ত পুণ্যকর্মের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে করধার্যা করিয়াছিলেন। পরাধীনতা যঁাহার নীচভাব প্রকাশ করিয়াছিল, সেই চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াও, তিনি বিনয়ানতদেহে বিরাজ করিতেন।

“দুর্ভয় শত্রুর (বঙ্গপতির স্বকীয়) শ্রেষ্ঠ গজ, অশ্ব, রথসমূহের একত্র সমাবেশে গাঢ় মেঘের স্থায় অঙ্ককাররূপে প্রতীয়মান বঙ্গপতিকে পরাজিত করিয়া, তিনি ত্রিলোকের একমাত্র আলোকদাতা উদীয়মান সূর্যের স্থায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

“বিশ্ববাসিগণের হিতে রত তঁাহার অসাধারণ [অতীন্দ্রিয়] পরাক্রম [আত্মবৈভব] আনর্ভ, মালব, তুরুঙ্গ, বৎস, মৎস্য প্রভৃতি দেশের রাজ্যগণের গিরিভূগ বলপূর্ব্বক অধিকার দ্বারা শৈশবকাল হইতে [আকুমারং] পৃথিবীতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।”

এই পরাশ্রিত চক্রায়ুধ যে ধর্মপাল কর্তৃক কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত চক্রায়ুধ এবং এই “বঙ্গপতি” যে স্বয়ং ধর্মপাল, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না। ধর্মপাল এবং তঁাহার অনুগত কাশ্যকুঞ্জেশ্বরের সহিত নিশ্চয়ই প্রতীহার-রাজ্য নাগভট্টের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; এবং পাল-রাজ্যগণের তাম্রশাসনে যখন ধর্মপাল কর্তৃক নাগভট্টের পরাজয়ের উল্লেখ নাই, পক্ষান্তরে প্রতীহার-রাজ্যগণের প্রশস্তিতে নাগভট্ট কর্তৃক চক্রায়ুধ এবং ধর্মপাল উভয়েরই পরাজয়ের উল্লেখ আছে তখন প্রতীহার-রাজ্যগণের প্রশস্তিকারের কথায় অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু যঁাহারা বলেন, নাগভট্টই চক্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন,* তঁাহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ গোয়ালিয়রের প্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে চক্রায়ুধ সম্বন্ধে “জিত্বা” বা “জয় করিয়া”, এই মাত্রই বলা হইয়াছে, তঁাহার পদচ্যুতির কোনও আভাস পাওয়া যায় না। প্রশস্তিকার নাগভট্ট কর্তৃক আনর্ভ, মালব, তুরুঙ্গ, বৎস, মৎস্যাদি রাজ্যের গিরিভূগ-অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কাশ্যকুঞ্জ অধিকারের উল্লেখ করেন নাই। এই সকল কারণে অনুমান হয়, নাগভট্ট কাশ্যকুঞ্জ অধিকার

* V. A. Smith's Early History of India ; pp. 349—350.

করিয়াছিলেন না, মৎস্য প্রভৃতি কাণ্ডকুঞ্জ-রাজের অনূগত রাজ্যানিচয় আক্রমণ করায়, তাঁহার সহিত “বঙ্গপতির” এবং চক্রাঘ্নের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন।

॥ ধর্মপাল ও মিহিরভোজ ॥

নাগভট্টের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রামভদ্র কাণ্ডকুঞ্জ অধিকার করিয়া-
ছিলেন, এরূপ উল্লেখও গোয়ালিয়রের প্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।
রামভদ্রের সহিত কাণ্ডকুঞ্জের অধিরাজ “বঙ্গপতি”র সংঘর্ষেরও উল্লেখ নাই।
কিন্তু রামভদ্রের পুত্র মিহির-ভোজ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

“যস্য বৈরি-বৃহদ্বক্ষান্দহতঃ কোপ-বহিনা।

প্রতাপাদর্শসাং রাশীন্পাতুর্কৈতুফ্যামাবভৌ ॥” (২১ শ্লোক)

“কোপাঘ্নির দ্বারা পরাক্রান্ত শত্রু বঙ্গগণকে দহনকারী এবং প্রতাপের দ্বারা
সাগরের জলরাশি পানকারী তাঁহার তৃষ্ণাভাব শোভা পাইয়াছিল।”

ধর্মপালের সহিত প্রতীহার-রাজ ভোজের যে সময় উপস্থিত হইয়াছিল,
সৌরাস্ত্রের মহাসামন্ত দ্বিতীয় অবনীবর্ষার ৯৫৬ সম্বতের [৮৯৯ খৃষ্টাব্দের]
তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাসামন্ত দ্বিতীয়
অবনীবর্ষা, ভোজদেবের পাদানুধ্যাত মহেন্দ্রপালদেবের, সৌরাস্ত্রের মহাসামন্ত
ছিলেন। ৫৭৪ বলভী সম্বতের [৮৯৩ খৃষ্টাব্দের] একখানি তাম্রশাসন হইতে
জানা যায়,—দ্বিতীয় অবনীবর্ষার পিতা বলবর্ষাও ভোজদেব-পাদানুধ্যাত
মহেন্দ্রাঘ্নের (মহেন্দ্রপালের) মহাসামন্ত ছিলেন।* ইহাতে অনুমান হয়,
—বলবর্ষার পিতামহও প্রতীহার-রাজগণের সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।
প্রথমেস্ত তাম্রশাসনে বলবর্ষার পিতামহ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

“অজনি ততোহপি শ্রীমান্ বাহুকধবলো মহানুভাবো যঃ।

ধর্মমবমপি নিতাং রণোদ্যতো নিনশাদ ধর্মং ॥” (৮ শ্লোক)†

“তৎপর মহানুভাব শ্রীমান্ বাহুকধবল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি
নিতা ধর্মপালন করিলেও রণোদ্যত হইয়া ধর্মকে ধ্বংস করিয়াছিলেন।”

এই তাম্রশাসনখানিতে অনেক ভুল আছে। এ স্থলে ডঃ কিল্‌হর্নের
সংশোধিত পাঠই উদ্ধৃত হইল। কিল্‌হর্ন মনে করেন, বাহুকধবল মিহির-
ভোজের সামন্ত ছিলেন এবং এই ধর্ম, বঙ্গ-পতি ধর্মপাল। গোয়ালিয়র
প্রশস্তিতে মিহির-ভোজ কর্তৃক কাণ্ডকুঞ্জ-অধিকারের উল্লেখ নাই; কিন্তু

* Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 5.

† Ibid, p. 7.

তাঁহার (যোধপুর-রাজ্যের অন্তর্গত দৌলতপুরায় প্রাপ্ত) ৯০০ বিক্রম সম্বতের (৮৪৩ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসন মহোদয়ে বা কাগুকুজে সম্পাদিত বলিয় উল্লিখিত হইয়াছে।* সুতরাং গোয়ালিয়র প্রশস্তি-রচনার পরে এবং দৌলতপুরার তাম্রশাসন সম্পাদনের (৮৪৩ খৃষ্টাব্দের) পূর্বে কোন সময়ে ভোজ কর্তৃক কাগুকুজ অধিকৃত হইয়াছিল। যে যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া ভোজ কাগুকুজ-অধিকারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধেই সম্ভবত মহাসামন্ত বাহুকধবল উপস্থিত ছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী [কাগুকুজ] অধিকারে সমর্থ হইলেও, প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোজ হর্ষবর্দ্ধনের শ্যায় “সকলোত্তরাপথেস্বর” হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। উত্তরাপথের পূর্বভাগে অবস্থিত গোড়-রাজ্যে ভোজ কখনও হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মধ্য-ভারতে রাষ্ট্রকূট-পরবল, গোড়াধিপ ধর্মপালের আশ্রয়ে, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়া-ছিলেন। পশ্চিমভাগে লাটপ্রদেশ [বর্তমান গুজরাত] মাগধেটের রাষ্ট্রকূট-রাজের “মহাসামন্তাধিপতির” অধিকৃত ছিল। লাটের রাষ্ট্রকূট-মহাসামন্তাধিপতি দ্বিতীয় ধ্রুবরাজের [৮৬৭ খৃষ্টাব্দের] একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়,—ধ্রুবরাজ যুদ্ধে মিহিরভোজকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল ও মিহির-ভোজ এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কাহারও আশা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছিল না। কিন্তু ধর্মপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে গোড়-মণ্ডলে সুখশান্তি বিরাজমান ছিল। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, “গ্রামোপকণ্ঠে বিচরণশীল গোপালকগণের মুখে, প্রতি গৃহের চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণের মুখে, প্রতি বাজারে মানাধ্যক্ষগণের মুখে এবং প্রতি প্রমোদগৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষিগণের মুখে নিজের প্রশংসাগীতি শ্রবণ করিয়া, ধর্মপাল সর্বদা লজ্জাবনত মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।” এই শ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার অভিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না; এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত এরূপ বিশেষোক্তি ধর্মপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ যাঁহার পিতাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্মপাল যে প্রজারঞ্জে যত্ববান হইবেন এবং তাঁহার যে প্রতিভা এক সময় তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম-পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজারঞ্জে সফল মনোরথ হইবেন, ইহাতে, আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

* Keilhorn's List of Northern Inscriptions, No. 710.

॥ দেবপাল ॥

ধর্মপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী দেবপালদেবও পিতা পিতামহের স্থায় পরাক্রমশালী ছিলেন। ধর্মপাল যে পদলাভ করিয়াও রক্ষা করিতে পারেন নাই, দেবপালের পক্ষে উত্তরাপথের সেই সার্বভৌমের পদলাভ আর সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিভায় এবং গৌড়জনের বাহুবলে উত্তরাপথ এবং দক্ষিণপথ এই উভয় খণ্ডের নৃপতি-সমাজে শ্রেষ্ঠতালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপালের আদেশানুসারে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পাল, উৎকলে এবং কামরূপে গৌড়েশ্বরের আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের [ভাগলপুরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, জয়পাল ভ্রাতা দেবপালের আজ্ঞায় দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, উৎকলপতি দূর হইতে নাম শুনিয়াই ভয়-বিহ্বলচিত্তে স্বীয় রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং বন্ধুপরিবেষ্টিত প্রাগ্-জ্যোতিষপতি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া, যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।* ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল-বীরবাহু সম্ভবত এই সময়ে প্রাগ্-জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাগ্-জ্যোতিষপতি পরাক্রান্ত গৌড়াধিপের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যিনি জয়পালের নাম শুনিয়াই রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই উৎকলপতি যে কে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। খৃষ্টীয় নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দের অর্থাৎ কলিঙ্গের গঙ্গ-

* “রামচরিতে”র ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই শ্লোকের মর্মস্বরূপ লিখিয়াছেন, “Jayapāla was a warrior and led several expeditions to Orissa and Kamarupa.” কিন্তু ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্মমঙ্গল অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, “Lausena is said to have conquered Kamarupa and Kalinga countries for Devapala.” (p. 8) ঘনরামের “শ্রীধর্মমঙ্গল” অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। “শ্রীধর্মমঙ্গলে” “ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর” লব্ধকে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা তাম্রশাসন-লব্ধ প্রমাণেব বিযোধ্য। দেবপালের তাম্রশাসনমতে ধর্মপালের উত্তরাধিকারীর জননীক নাম গঙ্গাদেবী, ঘনরামের মতে বলভা। দেবপাল ব্যতীত খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ধর্মপালের ত্রিভুবনপাল নামক আর এক পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ঘনরামের ধর্মপাল, অপুত্রক মহারাজা অখিলে প্রকাশ”; পরে সমুদ্রের ওঁসরে নির্বাসিতা বলভার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঘনরাম কোথাও বলভার এই পুত্রের নাম করেন নাই, তাঁহাকে শুধু “গৌড়েশ্বর” বলিয়া ক্লোন্ত হইয়াছেন। সূত্রবাং শুধু ঘনরামের উপবে নির্ভর করিয়া, জয়পালের কামরূপ এবং উৎকল আক্রমণ “expeditions” বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, ত্রেতার হনুমান বাহার নিকট আনাগোনা করিতেন সেই লাউসেনকে কামরূপ এবং কলিঙ্গ-বিজয়ী বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

বংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮—১১৪২ খৃঃ অব্দ) কর্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের পূর্বে পর্য্যন্ত উড়িষ্যার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কলিঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা সপ্তম শতাব্দীতে যেমন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের এবং অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়াধিপ হর্ষের পদানত হইয়াছিল, জয়পাল কর্তৃক উড়িষ্যার আক্রমণের কাল হইতে উৎকলপতিগণও সম্ভবত সেইরূপ পাল-রাজগণের পদানত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

॥ দেবপালের দ্বিধিক্রয় ॥

গৌড়াধিপ দেবপালের সেনানায়কের পক্ষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে বা উৎকলপতিকে পরাভূত করা খুব সহজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতার বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধনে প্রয়াসী হইয়া, দেবপালকে ভারতের প্রধান প্রধান নরপালগণের সহিত যে বিরোধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মপালের মন্ত্রী (গর্গের পুত্র) দর্ভপাণি দেবপালের প্রথম মন্ত্রী ছিলেন। দর্ভপাণির প্রপৌত্র গুরবমিশ্র-প্রতিষ্ঠিত হরগৌরীর (বাদলের) স্তম্ভে দর্ভপাণি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—“তাঁহার নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল-নৃপ হস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্ম্মদার জনক বিদ্যাপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ-ললাট-শোভিত ইন্দুকিরণে উদ্ভাসিত হিমাচল পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যের উদয়াস্তকালে অরুণরাগরঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৫)।” সকল উত্তরাপথ দেবপাল করদ করিয়াছিলেন, একথা সত্য না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি রাজ্যলাভ করিয়াই, উত্তরাপথের নরপতিগণের সহিত যে যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে লাভবান না হইলে, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত যে হইয়ে নাই, একথা অকাতরে অনুমান করা যায়। দর্ভপাণির পর তাঁহার পৌত্র কেমদারমিশ্র দেবপালের মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন। তখনও দেবপালের সহিত অগ্ৰাণ্ড প্রধান প্রধান নৃপতিগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল। হরগৌরীর স্তম্ভে কেমদারমিশ্র-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—“তাঁহার পরামর্শমতে গৌড়েশ্বর উৎকলকুল উন্মূলিত করিয়া হুণ-গর্ক হরণ করিয়া, ত্রবিড়রাজ এবং গুর্জররাজের দর্প খর্ব্ব করিয়া দীর্ঘকাল সাগরাধারা বসুন্ধরা সম্ভোগ করিয়াছিলেন (১৩)।” এই ত্রবিড়রাজ অবশ্য মাগধেটের রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ (আনুমানিক ৮৭৭—৮১৩ খৃষ্টাব্দ) এবং গুর্জর-নাথ গুর্জরের প্রতীহার বংশীয় মিহির-ভোজ, যিনি তৎকালে কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের কহীদে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেবপাল

ও দ্বিতীয় কৃষ্ণের বিরোধের পরিণামের অন্তরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই শাসনের পরদশ শ্লোকে দ্বিতীয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,* “প্রথম অমোঘ-বর্ষের, গুর্জরের ভয় উপাদনকারী, লাটের ঐশ্বর্যাজনিত বৃথা-গর্ব-হরণকারী, গোড়গণের বিনয়ব্রতের শিক্ষাগুরু, সাগরতীরবাসিগণের নিদ্রাহরণকারী, দ্বারস্থ অঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ এবং মগধগণকে আজ্ঞাবহনকারী, সত্যবাদী, দীর্ঘকাল ভুবনপালনকারী শ্রীকৃষ্ণরাজ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল (১৫)।”

উভয় পক্ষের প্রশান্তিকার যেখানে সমস্বরে বিজয় ঘোষণা করে, সেখানে সত্য-উদ্ধার সুকঠিন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেবপাল ও দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের বিরোধের পরিণামের কিঞ্চিৎ আভাস তৃতীয় পক্ষের প্রশান্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরির (জবলপুরের নিকটবর্তী তেবারের) কলচুরি রাজ কর্ণের [১০৪২ খৃষ্টাব্দের, বারাণসীতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে কলচুরি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোকিল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—†

ভোজে বল্লভরাজে শ্রীর্ষে চিত্রকূট ভূপালে।

শঙ্করগণে চ রাজনি যস্যাসীদভয়দঃ পাণিঃ ॥” (৬ শ্লোক)

“যাঁহার ভুজ ভোজকে, বল্লভরাজকে, চিত্রকূটপতি শ্রীর্ষকে এবং রাজা শঙ্করগণকে অভয়দান করিয়াছিল।”

বিল্বহরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কোকিল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—‡

জিত্বা কংসং যেন পৃথ্বীমপূর্বক্লীত্রিস্তম্ভ-দম্বমারোপ্যতে স্ম।

কৌস্তোস্তব্যান্দিশ্বসৌ কৃষ্ণরাজঃকৌবের্যাক্ষশ্রীনিধিভোজ্জদেবঃ ॥”

(১৭ শ্লোকঃ)

“যিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, দুইটি অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া-ছিলেন,—দক্ষিণদিকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাজ এবং উত্তরদিকে শ্রীনিধি ভোজদেব।”

দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ কৃষ্ণবল্লভ নামেও পরিচিত ছিলেন। সুতরাং কোকিলের নিকট অভয়প্রাপ্ত বল্লভরাজ, এবং তাঁহার দ্বারা দক্ষিণদিকে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরাজ একই ব্যক্তি, কোকিলের জামাতা দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ। ভোজদেব অবশ্যই গুর্জর-

* “তস্যোত্তীর্ণিত গুর্জরো হতহটলাটোস্তশ্রীমণে।
গোড়ানাং বিশয়ব্রতান্গণগুৰুঃ সামুদ্রানিজাহরঃ।
দ্বারহাজ-কলিঙ্গ-গাঙ্গমগধৈরভ্যক্তিভাজ শিৱং
হৃদ্র সপ্তনৃত্তবাগ্ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজো ভবৎ ॥

Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 283.

† Epigraphia Indica, II, p. 306.

‡ Epigraphia Indica, I, p. 258.

প্রতীহার মিহির-ভোজ ; চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষ জেজাকভুক্তির চন্দেল বংশীয় রাজা শ্রীহর্ষ।† এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ শত্রুর হস্ত হইতে কোকিল এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপালগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন? তৎকালে গোড়েশ্বর দেবপাল উন্ন রাষ্ট্রকূট-রাজ বা কাশ্যকুজ রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ আর কোন নরপালের পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সূত্রাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোজ, কলচুরি-রাজ কোকিল, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং চন্দেল-রাজ শ্রীহর্ষ, আশ্বরক্ষার জগ্ন সম্মিলিত হইয়া, বিজিগীষু দেবপালের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রবল বাধা না পাইলে, হয়ত দেবপাল উত্তরাপথের সার্বভৌমের পদ-লাভে সমর্থ হইতেন।

দেবপাল যে কলচুরি বা চেদিরাজ্য অতিক্রম করিয়া, মধ্যভারতের পশ্চিমাংশ আক্রমণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, “হুণ-গর্ক-হরণ” প্রসঙ্গই তাহার প্রমাণ। ষষ্ঠ শতাব্দের প্রথমাঙ্গে যশোধর্ম কর্তৃক পরাজিত হুণ-রাজ মিহির-কুলের মৃত্যুর পর, হুণ-রাজ্যের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না; কিন্তু উত্তরাপথের স্থানে স্থানে, বিশেষত মধ্যভারতে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হুণ-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। “হর্ষচরিতে” থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধন “হুণহরণের সিংহ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; এবং [৬০৫ খৃষ্টাব্দে] তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে, তিনি জ্যোষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে “হুণ-হত্যার জগ্ন উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন,” এরূপ উল্লেখ আছে। মিহির-ভোজের পুত্র কাশ্যকুজরাজ মহেন্দ্রপালের সৌরাষ্ট্রের মহাসামন্ত দ্বিতীয় অবনিবর্ধনা-যোগের, উনায় প্রাপ্ত ৯৫৬ বিক্রম সম্বতের (৮৯৯ খৃষ্টাব্দের) তান্ত্রশাসনে, তাঁহার পিতা বলবর্ধনা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—তিনি জজ্জপাদি নৃপতিগণকে নিহত করিয়া, “ভুবন হুণবংশহীন করিয়াছিলেন।”‡ দেবপালের পরবর্ত্তী যুগে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, হুণগণ মালবে উদীয়মান পরমার-রাজবংশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পদ্মগুপ্তের “নবসাহসারু চরিত”* এবং পরমার রাজগণের প্রশস্তি‡ হইতে জানা যায়,—পরমার-রাজ দ্বিতীয় শিয়ক, তদীয় পুত্র উৎপল-মুঞ্জরাজ (৯৭৫—৯৯৪ খৃঃ অঃ) এবং সিন্ধুরাজ যথাক্রমে হুণরাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। দেবপাল সম্ভবত মালবের হুণগণের গর্ক খর্ব করিয়াছিলেন।

† Ibid, Vol. II, pp. 300—301.

‡ Ibid, IX, p. 8.

* Indian Antiquary of 1907.

‡ Indian Antiquary, Vol. XVI, p. 23, Epigraphia Indica, Vol. I, p. 236.

গোড়েশ্বর দেবপালের প্রতীহার, চাম্পেল্ল, কলচুরি, এবং রাষ্ট্রকূট-রাজের সহিত বিরোধ, গোড়গণের সকলোত্তরাপথের একাধিপত্য লাভের তৃতীয় চেষ্ঠা। শশাঙ্ক এবং ধর্মপাল এক্ষেত্রে যতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে দেবপাল ততদূর কৃতকার্য হইতে (কাণ্ডকুঞ্জ পর্যন্ত পঁছছিতে) না পারিলেও, পরাক্রমে তিনি শশাঙ্ক এবং ধর্মপালের তুল্য আসন, এবং সমসাময়িক নরপালগণের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন, পাইবার যোগ্য। দেবপালের [মুঙ্গেরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে প্রশস্তিকার যে লিখিয়াছেন,—“একদিকে হিমাচল, অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ, একদিকে বরুণালয় (সমুদ্র), অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (অপর সমুদ্র) এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিতেছেন,—একথা কবিকল্পিত হইলেও, ইহার অভ্যন্তরে গোড়াধিপ এবং গোড়জনের অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষের ছায়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; এবং দেবপাল এই অভিলাষপূরণে সমর্থ না হইলেও, উহার উদ্যোগ করিতে গিয়া, তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় নরপতিসমাজে বাহুবলে ব্রীয শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে, দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, গোড়রাজ্যের উন্নতির যুগের অবসান হইয়াছিল। প্রায় একই সময়ে, [৯০৭ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে,] মিহির-ভোজের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রপালের মৃত্যুতে, প্রতিযোগী কাণ্ডকুঞ্জ-রাজ্যেরও অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল। এই দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হইতেই, উত্তরাপথের অধঃপতনের সূত্রপাত। মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক উত্তরাপথ বিজিত হইবার তখনও প্রায় তিনশত বৎসর বাকী ছিল। কিন্তু উত্তরাপথের এই তিনশত বৎসরের ইতিহাস তুরস্ক-বিজ্ঞতার সাদর অভ্যর্থনার উদ্যোগের সুদীর্ঘ কাহিনীমাত্র।

॥ প্রথম বিগ্রহপাল ॥

দেবপালের মৃত্যুর পর, বিগ্রহপাল গোড়-রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হরগোরীর [বাদল] স্তম্ভে বিগ্রহপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। নারায়ণপালের [ভাগলপুরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে বিগ্রহপাল “অজাতশত্রু”, “শত্রুগণের গুরুতর বিষাদ”, এবং “সুহৃৎজনের আঞ্জীবনস্থায়ী সম্পদ”-বিধানকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে যে প্রশস্তিকার ধর্মপাল কর্তৃক কাণ্ডকুঞ্জ-বিজয় এবং দেবপালের

আদেশে জয়পাল কর্তৃক কামরূপ ও উৎকল বিজয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, বিগ্রহপালের সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার থাকিলে তিনি যে তাহা না বলিয়া ছাড়িতেন, এরূপ বোধ হয় না। বিগ্রহপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালের প্রতিভা এবং উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন। তিনি হৈহয় বা কলচুরি রাজ-কুমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে কলচুরি-রাজ কোকল্ল এবং তাঁহার পুত্রগণ এতই পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে প্রতিবেশী নৃপতিগণ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকল্লের দুহিতার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ কোকল্লের দুই পৌত্রীর, এবং জগত্তুঙ্গের পুত্র রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় ইন্দ্র কোকল্লের প্রপৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।* বিগ্রহপালের মহিষী লজ্জাদেবী সম্ভবতঃ কোকল্লের পুত্রী বা পৌত্রী ছিলেন। গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কঙ্কাল নামক স্থানে প্রাপ্ত কলচুরি-রাজ সোড়দেবের ১১৩৬ বিক্রম-সম্বতের (১০৭৯ খৃষ্টাব্দের) একখানি তাম্রশাসনে মিথিলা বা ত্রিহুতের উত্তরদিকে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বতন্ত্র কলচুরি বা হৈহয়-রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, সোড়দেবের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ (অতিরিক্ত প্রপিতামহ) গুণাধোষিদের বা গুণসাগর সংগ্রামে গোড়-লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছিলেন (“আহুতা গোড়লক্ষ্মী”)।† গোড়াধিপ বিগ্রহপালের সহিতই সম্ভবতঃ গুণাধোষিদের যুদ্ধ হইয়াছিল। গোড়েশ্বরী লজ্জাদেবী এই গুণাধোষিদের কন্যাও হইতে পারেন।

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর, মহারানী লজ্জার গর্ভজাত নারায়ণপাল পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র, হরগোরীর গরুড়ন্ত-প্রতিষ্ঠাতা গুরবমিশ্র, নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই স্তম্ভলিপির একটি শ্লোকে (১৯) নারায়ণপাল “বিজিগীষু” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। নারায়ণপালের রাজত্বের সমুদয় বৎসরে ভাগলপুরের তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল। এই শাসনের আটটি শ্লোকে নারায়ণপালের শ্রায়নিষ্ঠা, দান-শীলতা, এবং সাধু চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে; কিন্তু তিনি বিজিগীষু হইয়া, কোন দেশ আক্রমণ বা জয় করিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালও শান্তিপ্ৰিয় ছিলেন। মহীপালের দিনাজ-পুর জেলার অন্তর্গত বাণনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—রাজ্যপাল

* Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. II, p. 3.

† Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 85.

“জলধিমূল-গভীরগর্ভ” জলাশয় এবং “কুল-পর্কাততুলা কক্ষবিশিষ্ট দেবালয়” নির্মাণ করিয়া কীৰ্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটভূঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই “ভূঙ্গ” সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ। রাজ্যপাল এবং ভাগ্যদেবীর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল, পিতার পরলোক গমনের পর, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, “চিরতরে” “অবনীৰ এক-মাত্র ভর্তা”, ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

বিগ্রহপাল এবং তাঁহার পুত্র, পৌত্র, এবং প্রপৌত্র যখন যথাক্রমে গোড়-মণ্ডলে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তখন জেজাকভূঙ্গির (বর্তমান বৃন্দেলখণ্ডের) চন্দেল্ল-রাজগণ পরাক্রমে গোড়েশ্বর এবং কাশ্যকুঞ্জেশ্বর, উত্তরা-পথের এই উভয় দিকপালকে, অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতীহার-রাজ মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপাল বা ক্ষিতিপালকে (?) এবং ক্ষিতিপালের উত্তরাধিকারী দেবপালকে, আত্মরক্ষার জন্ত, চন্দেল্ল-রাজগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হইয়াছিল। চন্দেল্ল-রাজ যশোবর্মা ১০১১ সনতে (১৫৪ খৃস্টাব্দে) উৎকীর্ণ খাজুরাহের একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায়, —যশোবর্মার পিতা হর্ষদেবের সহায়তায়, সিংহাসনচ্যুত ক্ষিতিপাল, কাশ্যকুঞ্জ-সিংহাসন-পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন।* এই ক্ষিতিপাল বা মহীপাল রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় ইস্ত্র কত্বক কাশ্যকুঞ্জ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন।† মহীপালের উত্তরাধিকারী কাশ্যকুঞ্জপতি দেবপাল চন্দেল্ল-রাজ যশোবর্মা'কে বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন; যদি এই চন্দেল্ল-রাজের (যশোবর্মার) প্রশস্তিকারের বাক্যে আস্থা-স্থাপন করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, তিনি গোড়পতিকেও ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কারণ, এই শিলালিপির একটি (২৩) শ্লোকে যশোবর্মা “গোড়ক্রীড়ালতাসি”, [ক্রীড়ার লতার মায় গোড়গণকে ছেদনক্ষম অসি] এবং “শিখিলিত-মিখিল” [মৈখিল-গণের বলক্ষয়কারী] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

* বৃষ্টি মিত্রজয়মের পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি “অষ্টসাহস্রিক-প্রজ্ঞা-পারমিতা” পু'খির অন্তে লিখিত আছে,—“পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমর্শোগত-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ-গোপালদেব-প্রবর্ত্তমান-কল্যাণ-বিজয়রাজ্যেত্যাদি সনৎ ১৫ অশ্বিনে দিনে ৪ শ্রীমদ-বিজয়শালদেব-বিহারে লিখিতেন্নং ভগবতী।” এই গোপালদেব দ্বিতীয় গোপাল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।—Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, pp. 150-151

† Epigraphia Indica, Vol. I, pp. 122-135.

কালের কঠোর শাসনে কিছুই স্থিতিশীল হইবার সাধ্য নাই। হয় উর্দ্ধগতি উন্নতি, আর না হয় নিশ্চলভাবে থাকিতে গেলে, কালস্রোতের খরবেগে অধোগতি। দেবশালের মৃত্যুর পর, অর্ধশতাব্দী কাল গোড়রাজ্য উন্নতিহীন নিশ্চল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখন হইতেই, ভিতরে ভিতরে, অধঃপাতের সূত্রপাত হইতেছিল। দ্বিতীয় গোপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ভাগ্যে অখণ্ড গোড়-রাজ্য সম্ভোগ ঘটয়া উঠিয়াছিল না। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহীপালের বাণনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, “(দ্বিতীয় বিগ্রহপাল) হইতে শ্রীমহীপালদেব নামক অবনীপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে যুদ্ধে সকল বিপক্ষ নিপাতিত করিয়া, অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, ভূপালগণের মস্তকে চরণপদ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন।” এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—গোড়-রাজ্যের কতকাংশ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। নিরর্থক হইলে, এরূপ অগৌরবকর কথা কদাচ তাঁহার পুত্রের তাম্রশাসনে স্থানলাভ করিত না। এখন জিজ্ঞাস্য, কাহার দ্বারা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন?

॥ কাষোজাষয়-গোড়পতি ॥

যে স্থানে মহীপালের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত সেই বাণগড় বা বাণনগরের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজবাড়ীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটি প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

১।

ওঁ

দুর্ধারারি-বক্রথিনী-প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি

২।

যস্য মার্গণ-গুণ-গ্রামগ্রহো গীয়তে।

কাষোজাষয়জেন গোড়পতি-

৩।

না তেনেন্দুমৌলেরয়ং

প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটা-বর্ষণে ভূ-ভুষণঃ ॥

“আনন্দে বিদ্যাধরণ স্বর্গলোকে যাঁহার দুর্ধমনীয় শক্রসৈন্য-দমনে দক্ষতা এবং দানকালে যাচকের গুণগ্রাহিতার বিষয় গান করিতেছেন, কাষোজাষয়জ সেই গোড়পতি কুঞ্জরঘটা (৮৮৮) বর্ষে ইন্দুমৌলির (শিবের) এই পৃথিবীর ভুষণ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।”

এই শ্লোকটিতে যে ঐতিহাসিক তথ্য নিবন্ধ রহিয়াছে, তাহার আলোচনার পূর্বে, সংক্ষেপে এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ইতিহাস বলা আবশ্যিক। দিনাজপুরের তখনকার কালেক্টর ওয়েস্টমেকট এই শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়া, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কৃত অনুবাদ সহ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের “ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি” পত্রে ইহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। * ওয়েস্টমেকটের প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ভাণ্ডারকর-কৃত একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন; † এবং ভাণ্ডারকর তাহারও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ‡ ১২৮৮ বঙ্গাব্দের “বান্ধব”-পত্রে এক জন লেখক, পুনরায় রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। § ইহার পর, এই লিপির কথা পশ্চিমবঙ্গ একেবারে ডুলিয়া গিয়াছিলেন। কিলহর্গ “এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা” পত্রের পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে উত্তরপাথের (Northern India) প্রাচীন লিপিসমূহের যে তালিকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই লিপির নাম গন্ধ-নাই। বঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার রুক ১৯০০-১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে অতি সংক্ষেপে এই লিপির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভ্রমক্রমে “গৌড়পতি”কে “সীদপতি” পাঠ করায়, তাহার ব্যাখ্যা বার্থ হইয়া গিয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল ও ভাণ্ডারকরের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে “কুঞ্জরঘটাবর্ষণ” পদের কথাই উল্লেখযোগ্য। “কুঞ্জর” অর্থে ৮ এবং “কুঞ্জরঘটা” অর্থে ৮৮৮। “কুঞ্জরঘটাবর্ষণ” পদে [পাণিনির ২।৩।৬ সূত্র অনুসারে] ক্রিয়া-পরিসমাপ্তি-অর্থে কালবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। “কুঞ্জরঘটাবর্ষণ” পদের ইহাই সহজ অর্থ। ৮৮৮কে শকাব্দ ধরিলে, ২৬৫-১৬৬ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই লিপির অক্ষরের বিচার করিলে, এবং লিপির প্রাপ্তি স্থানের বা বরেন্দ্রভূমির পূর্বাঙ্গের ইতিহাসের আলোচনা করিলেও, ৮৮৮ শকাব্দ, [১৬৬ খৃষ্টাব্দই] “কাছোজায়জ গৌড়পতি”র আবির্ভাব-কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বরেন্দ্রভূমিতে এ পর্যন্ত যে সকল প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে খালিমপুরের প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসনের * এবং তথাকথিত বাদল-স্তম্ভে

* ১২৭-১২৮ পৃ:।

† ঐ ১২৭ পৃ:।

‡ ঐ ২২৭ পৃ:।

§ ১৮০-১৮২ পৃ:।

* Journal of A. S. B. of 1897, Part I, এ খালিমপুরের শাসনের চিত্র দ্রষ্টব্য।
অক্ষয়-বিচার Epigraphia Indica, Vol. IV., ১৪০-১৪৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

উৎকীর্ণ নারায়ণপালের মন্তী গুরবমিশ্রের প্রশস্তির + অক্ষরের সহিত এই লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে, বাদল-সুস্ত লিপির অক্ষরের সহিত ইহার অক্ষরের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, খালিমপুরের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত এতদুভয় লিপির অক্ষরের অনেক প্রভেদ। খালিমপুরের তাম্রশাসনের অক্ষরের মধ্যে ম, প, ও স-এর মাথায় ফাঁক আছে। এই লক্ষণটি প্রাচীনতর কালের লিপির প, ম ও স-তেও লক্ষিত হয়। কিন্তু বাদল-সুস্তলিপির প, ম স এর মত, দিনাজপুর-সুস্তলিপির প, ম ও স-এর মাথা মাত্রায় ঢাকা। খালিমপুর-শাসনের অক্ষরের আর একটি লক্ষণ,—ম-এর নীচের দিকের বাম কোণে পুঁটুলি বা বৃত্ত দেখা যায় না; পুঁটুলির স্থানে উপরমুখী একটি টান আছে। কিল্‌হর্ণ লিখিয়াছেন,—“দেবপালের সময়ের ঘোষরীবার বৌদ্ধ-লিপিতে কয়েকটিমাত্র ম-এ পুঁটুলি দেখা যায়, কিন্তু বাদল সুস্তলিপির ও ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রশাসনের সমস্ত ম-ই পুঁটুলি-বিশিষ্ট।” সুতরাং নারায়ণপালের সময়ের লিপির অক্ষরের অনুরূপ অক্ষরবিশিষ্ট দিনাজপুরের সুস্তলিপিকে দশম শতাব্দীর পূর্বে স্থাপিত করা যাইতে পারে না।

বাদল-সুস্তলিপির স্থায় এই লিপির আর একটি লক্ষণ এই যে, ‘রেফ’ সর্বত্রই অক্ষরের মাথার উপর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পংক্তির ক, ২য় পংক্তির গর্গ, এবং ৩য় পংক্তির র্-এর ‘রেফ মাত্রার উপরেই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লিপির মধ্যে দুইখানি লিপি—বাণনগরে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসন এবং আমগাছিতে প্রাপ্ত মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহশালের তাম্রশাসন,—দিনাজপুর জেলাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিসমূহের ‘রেফের ব্যবহার সম্বন্ধে কিল্‌হর্ণ লিখিয়াছেন,—অনেকস্থলে “‘রেফ মাত্রার উপরে দেওয়া হয় নাই; যে অক্ষরের সহিত ‘রেফ যুক্ত হইবে, সেই অক্ষরের বাম দিকে মাত্রার সমসূত্রে একটি ক্ষুদ্র রেখামাত্র টানা হইয়াছে। * মহীপালের পুত্র নম্বপালের সময়ের (১৫শ বর্ষের) গঘার কৃষ্ণদ্বারকা-মন্দিরের শিলালিপিতেও মাত্রার উপর ‘রেফ দৃষ্ট হয় না। § সুতরাং রেফ দেওয়ার হিসাবে দেখিতে গেলে, এই

† Epigraphia Indica, Vol. II, p. 160, Plate.

* Journal A. S. B. of 1892 Part I, p. 78; Indian Antiquary, Vol. XXI, (1892), p. 97.

§ বঙ্গবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরেন্দ্র-মনস্কান-সমিতিতে এই শিলালিপির স্কন্দ ছাপ প্রদান করিয়াছেন।

লিপিকে মহীপালের দিনাজপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনেরও পূর্বে [দশম শতাব্দীতেই] স্থাপিত করিতে হয়।

“কাষোজায়য়জ্ঞ” অর্থে “কাষোজ” দেশীয় বা জাতীয় লোকের বংশ-সম্ভূত। ফরাসী পণ্ডিত ফুসে লিখিয়াছেন,—নেপালে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে, তিব্বত-দেশেরই নামান্তর “কাষোজ দেশ”।‡ সুতরাং “কাষোজায়য়জ্ঞ গোড়পতি” তিব্বত বা তৎপার্শ্ববর্তী কোনও প্রদেশ হইতে আসিয়া, বরেন্দ্র জয় করিয়া, বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রের নামান্তর গোড়ের নামানুসারে, গোড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই রূপই মনে করিতে হয়। ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে “কাষোজায়য়জ্ঞ” গোড়পতি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেই হয়ত তিনি হিমালয় প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে “অনধিকৃত” বা অনধিকারী কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, “কাষোজায়য়জ্ঞ গোড়পতিই” সেই “অনধিকৃত”।

“কাষোজ-বংশজ গোড়পতি” গোড়-রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। বরেন্দ্রদেশ তাঁহার পদানত হইয়াছিল, এরূপ নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। কারণ, বরেন্দ্রের কেন্দ্রস্থলেই—বাগনগরে,—তাঁহার কীর্তিচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; এবং বরেন্দ্র-দেশের অনেক স্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় আকারের কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি দেখা যায়, ইহারা তিব্বতীয় বা ভুটিয়া আক্রমণকারিগণের অর্থাৎ কাষোজ-বংশজ গোড়পতির অনুচরগণের বংশধর বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অনুমান করিবার কারণ, কাষোজ-বংশজ গোড়পতির সঙ্গে ভিন্ন বহুসংখ্যক মোঙ্গলীয় ঔপনিবেশিকের বরেন্দ্রে, অর্থাৎ করতোয়ার পশ্চিমতীরবর্তী ভূভাগে, প্রবেশের আর কোন অবসর দেখিতে পাওয়া যায় না। করতোয়ার পূর্বদিকবাসী, কামরূপী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞমান, কোচ এবং রাজবংশিগণের সহিত বরেন্দ্রবাসী, বর্ণব্রাহ্মণের যজ্ঞমান, কোচ, পলিয়া, এবং রাজবংশিগণের কোনরূপ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বরেন্দ্র যখন “কাষোজ-বংশজ গোড়পতির” করতলগত, এবং বিজিত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যখন গোড়রাজ্যের কোনও নিভৃত কোণে, [মগধে বা মিথিলায়,] লুক্কায়িত ছিলেন, তখন চন্দ্র-রাজ যশোবর্মার উত্তরাধিকারী ধর্মদেব অজ্ঞ ও রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন। খজুরাহোতে প্রাপ্ত ১০০২

খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে ধঙ্গ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—“তুমি কে ? কাঞ্চীরাজপত্নী ! তুমি কে ? অঙ্কাদিপত্নী ! তুমি কে ? রাঢ়রাজ-পত্নী ! তুমি কে ? অঙ্করাজ-পত্নী !” সমর-জয়ী রাজার (ধঙ্গের) কারাগারে সজ্জনয়না শত্রুপত্নীগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল ।”*

এই শ্লোকে কি পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে,—ধঙ্গ প্রকৃত প্রস্তাবে রাঢ় এবং অঙ্গের মহাসামন্তদ্বয়কে পরাজিত করিয়া, উভয়ের পত্নীগণকে বন্দি করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা,—কেবল এক পক্ষের প্রশস্তিকারের কথা শুনিয়া, তাহা বলা কঠিন । কিন্তু তৎকালে গৌড়রাজ্যের অংশ বিশেষের সহিত জেজাজুস্তির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, অগত্যও তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় । চন্দেল-রাজগণের যে দুইখানি শিলালিপি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, এই দুইখানিরই লেখক গৌড় বা বাঙ্গালী । প্রথম খানি “সংস্কৃতভাষাবিদ গৌড়কায়স্থ [করণিক] জঙ্গের দ্বারা” লিখিত ; দ্বিতীয় লিপির লেখক,—গৌড়কায়স্থ জয়পাল ।

পালরাজ্যের কেন্দ্র বরেন্দ্র যখন কাছোজ-বংশজ গৌড়পতির পদানত, এবং রাঢ় ও অঙ্গ চন্দেল-রাজ ধঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত, তখন প্রতিযোগী রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের এবং প্রতীহার-রাজ্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । ৯৭০ খৃষ্টাব্দে চালুক্য-বংশীয় তৈলপ, শেষ রাষ্ট্রকূট-নৃপতি দ্বিতীয় কর্জরাজকে পরাভূত করিয়া, দক্ষিণপথে চালুক্য-প্রাধাণ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । প্রতীহার-বংশেরও অধঃপতনের আর বড় বিলম্ব ছিল না । কচ্ছপঘাত-বংশীয় বজ্রদামন কান্ধকুজের প্রতীহার-রাজকে পরাভূত করিয়া, গোপাত্রি বা গোয়ালিয়র অধিকার করিয়াছিলেন । এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি অভিনব প্রতিদ্বন্দ্বী—পরমার-রাজ বাকপতি-মুঞ্জরাজের (৯৭৫, ৯৭৯ খৃঃ অঃ) বাহুবলে উন্নীত মালবরাজ্য এবং অনহীলপাটকের চৌলুক্যবংশীয় মুলরাজ-(৯৭৪—৯৯৫ খৃঃ অঃ) প্রতিষ্ঠিত গুজরাত-রাজ্য অদ্ভুত হইয়া উত্তরাপথে অধিকতর বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল । কিন্তু এই সময়ে, আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহাপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া পুনরায় গৌড়রাজ্যের ঐক্যসাধনে এবং পাল-রাজ্যকে আরও প্রায় সার্বভৌম পরমায়ু প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

*“কা ত্বং কাংচীনৃপতি-বনিতা কা ত্বমঙ্কাদিপ-ত্নী
কা ত্বং রাঢ়া-পরিবৃচৎসুঃ কা ত্বমঙ্কেশ-পত্নী ।
ইত্বালাপাঃ সমর-জয়িনো যত বৈরি-প্রিয়ানাং
কারাগারে সজ্জনয়নশীবরাণাং বভূবুঃ । (৪৫) ।”

“অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতুরাজ্য” বা কাশ্মীর-জাতীয় বিজেতার অধিকৃত বরেন্দ্রের উদ্ধার-সাধন মহীপালের প্রথম, এবং [বাণনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন-মতে], প্রধান কীর্তি। ধর্মপাল এবং দেবপালের শ্রায় মহীপালও দীর্ঘকাল গোড়-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, —মহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। একখানি পিস্তলের মূর্তিতে কানিংহাম মহীপালের রাজত্বের ৪৮ বর্ষের উল্লেখ দেখিয়াছেন।* এই দীর্ঘ রাজত্বকালে, বিদেশীয় আক্রমণকারীর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার জন্ত পুনরায় মহীপালকে অন্তর্ধারণ করিতে হইয়াছিল।

॥ রাজেন্দ্রচোলের অভিযান ॥

চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছে—†

“পরকেশরীবর্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে —যিনি.....ঐহার মহান্ সমরপটু সেনাঘারা (নিয়োক্ত দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন—দুর্গম ওড়-ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন); মনোরম কোশল-নাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যানবিশিষ্ট তন্দ্রবৃত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকলদিকে প্রসিদ্ধ তরুণলাড়ম্, সবেগে রণশুরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড়ুষ্ঠির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ, চর্মপাদুকা এবং বলয়-বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া, যিনি ঐহার অল্পত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের শ্রায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্; বালুকাময় তীর্থধৌতকারিণী গঙ্গা।”‡

* Smith's Early History of India, 2nd Ed., p. 368.

† Epigraphia Indica, Vol. IX, pp. 232—233.

‡ তিরুমলয়-পর্বত মাল্লাজ-প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট-জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই লিপির মূল উদ্ধৃত করা অসম্ভব। তৎপরিবর্তে উদ্ধৃত অংশের ডাক্তার হল্জ্ (Hultzsch) হৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

“In the 13th year (of the reign) of king Parakesarivarman *alias* the lord Sri-Rajendra-Choladeva, who.....seized by (his) great, warlike army (*the following*).....Odda-vishaya, which was difficult to approach, (and which he subdued in) close fights; the good Kosalai-

প্রথম রাজেন্দ্র-চোলদেব ১০১২ খৃষ্টাব্দে চোল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং তিরুমলয় পর্বতের লিপি তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে [১০২৪ খৃষ্টাব্দে] উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম রাজেন্দ্র-চোলের রাজত্বের নবম বর্ষে সম্পাদিত মেলপাড়ির চোলেস্বর-মন্দিরের লিপিতে বিজিত দেশসমূহের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ওড্ড-বিষয়াদির নাম নাই। § সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, প্রথম রাজেন্দ্র-চোল তাঁহার রাজত্বের নবম ও ত্রয়োদশ বৎসরের [১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের] মধ্যে ওড্ড-বিষয়, কোশল-নাড়ু, বঙ্গাল-দেশ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপি হইতে জানা যায়, গোড়াধিপ মহীপাল ১০৮৩ সম্বতে [১০২৬ খৃষ্টাব্দে] জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রথম রাজেন্দ্র-চোল “ওড্ড বিষয়” বা উড়িষ্যা, “তঙ্কণ-লাড়ম্” বা দক্ষিণরাঢ় * এবং “বঙ্গাল-দেশ” বা বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া, যে মহীপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহীপাল অবশ্যই পালবংশীয় গোড়াধিপ মহীপাল। প্রথম রাজেন্দ্র-চোল প্রকৃত প্রস্তাবে মহীপালকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার হস্তী এবং রমণীগণকে হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা শুধু এক পক্ষের কথা শুনিয়া, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্তু তিরুমলয়ের লিপিতে যে ভাবে প্রথম রাজেন্দ্র-চোলের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠে মনে হয়, তিনি গোড়রাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—উড়িষ্কার রাজা

nadu, where Brahmanas assembled; Tandabutti, in whose gardens bees abounded, (and which he acquired) after having destroyed Dharmapala (in) a hot battle; Takkanaladam, whose fame reached (all) directions, (and which he occupied) after having forcibly attacked Ranasura; Vangala-desa. where the rain-wind never stopped, (and from which) Govindachandra fled, having descended from his male elephant; elephants of rare strength and treasures of women, (which he seized) after having been pleased to put to flight on a hot battle-field Mahipala, decked (as he was) with ear-rings, slippers and bracelets; Uttiraladam, as rich in pearls as the ocean, and the Ganga, whose waters dashed against bathing-places covered with sand.”

§ Epigraphia Indica, Vol. VII, Appendix, List of S. India, No. 729 (also see Nos. 727 and 728.)

* বায় বাহাদুর বেক্সর এবং ডাক্তার হুল্জ “তঙ্কণ-লাড়ম্” দক্ষিণ-বিষাট বা দক্ষিণ-বেরার অর্থে এবং “উত্তির-লাড়ম্” উত্তর বেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ওড্ড বিষয়, বঙ্গালদেশ, এবং গঙ্গার সহিত উল্লিখিত দেখিয়া “লাড়ম্”কে রাঢ় অর্থে গ্রহণই সমীচীনতর বোধ হয়।

মহীপালকে করপ্রদান করিতেন।† চোলরাজ সম্ভবত উড়িষ্যা, বঙ্গ, এবং রাঢ়ের সামন্তগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; মহীপালের সহিত সম্মুখযুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্বেই হউক, আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী চোলরাজ গোড়রাজ্যের কোন অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহীপাল যে উপায়েই চোলরাজের আক্রমণ হইতে গোড়রাজ্যের উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকুন, তিনি যে সমরানুরাগী শশাঙ্ক, ধর্মপাল এবং দেবপালের স্থায় উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, শান্তিই ভালবাসিতেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহীপালের গোড়-সিংহাসনলাভের অনতিকাল পরেই, উত্তরাপথের সর্বনাশের—মুসলমান-ধর্মাবলম্বী তুরুক্ষগণকর্তৃক উত্তরাপথ বিজয়ের—সূত্রপাত হইয়াছিল। তুরুক্ষ-আক্রমণকারিগণের গোড়রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিবার তখনও প্রায় দুই শতাব্দী বিলম্ব থাকিলেও, তুরুক্ষগণ কর্তৃক পরিণামে গোড়বিজয়-রহস্য উদ্ঘাটনার্থ, এই দুই শতাব্দের গোড়রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথে তুরুক্ষ-প্রভাব-বিস্তারের ইতিহাসও সংক্ষেপে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

॥ মহীপালের কীর্তিকলাপ ॥

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের আরম্ভে (৭১১ খৃষ্টাব্দে) খালিফ-আল ওয়ালিদের সেনানী মহম্মদ কাশিমের নেতৃত্বাধীনে মুসলমানধর্মী আরবগণ সিদ্ধু এবং মুলতান অধিকার করিলেও, আরবপ্রাধান্যের যুগে, মুসলমান-প্রভাব সিদ্ধু ও মুলতানের বাহিরে বিস্তারলাভ করিতে পারিয়াছিল না। সেই যুগে পরাক্রান্ত সাহিরাজ্যের নৃপতিগণ উত্তরাপথের উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের পূর্বভাগ সাহিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাহিরাজ্য প্রথমে কুশাণ-সম্রাট কনিষ্কের বংশধরগণের পদানত ছিল। সুতরাং সাহিরাজ্যগণ জাতিতে তুরুক্ষ এবং সম্ভবত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও, কার্যত হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন; এবং মুসলমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য উত্তরাপথের রাজন্যবর্গের সাহায্যই প্রার্থনা করিতেন।* নবম শতাব্দির মধ্যভাগে কুশাণ-বংশীয় শেষ সাহি-রাজ কতোরমানের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী “লল্লিয়” বা

† Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. III, p. 134.

* Elliott's History of India, Vol. II, p. 415.

“কালার”, প্রভুকে পদচ্যুত করিয়া, সাহি-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।† কাবুল কুমাণ-বংশীয় সাহি-রাজগণের রাজধানী ছিল। লল্লিয়-সাহি সিঙ্গনদের পশ্চিমতীরবর্তী উদ্ভাণ্ডপুরে (উন্দ) স্বীয় রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। ২৫৬ হিজরি [৮৬৮-৯ খৃষ্টাব্দে] সিংহানের অধিপতি ইয়াকুব লয়স আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং কাবুল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।‡ ইহার কিয়ৎকাল পরে, তুর্কিস্থানের সামানী-বংশীয় অধিপতি ইসমাইল কর্তৃক গজনী সামানী-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের তৃতীয়পাদে, সামানী-রাজের একজন প্রভাবশালী সেনা-নায়ক, আলব-তিগীন, প্রভুর ব্যবহারে অসম্ভব হইয়া, গজনীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলব-তিগীনের সবুক্-তিগীন নামক একজন তুরক ক্রীতদাস ছিল। প্রভুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে, সবুক্-তিগীন গজনীর গদিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার দশ বৎসর পরে, [৯৮৭ খৃষ্টাব্দে] সবুক্-তিগীন উত্তরাপথের সিংহদ্বার [সাহি-রাজ্য] অধিকারে বন্ধপরিকর হইয়া, উহা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাহি-জয়পাল তখন উদ্ভাণ্ডপুরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সবুক্-তিগীন আরক্ সাহি-রাজ্য-ধ্বংসসাধনক্রমে অসম্পূর্ণ রাখিয়া, ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী মামুদ, প্রবলতর পরাক্রম সহকারে, সাহি-রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর, কাশুকুজ, কালঞ্জর (জেজাকভুক্ত) এবং উত্তরাপথের অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যবর্গ প্রাণপণে বিপন্ন সাহি-রাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। মামুদের গতিরোধ করিতে গিয়া, সাহি জয়পাল, তদীয় পুত্র সাহি আনন্দপাল, পৌত্র সাহি ত্রিলোচনপাল, একে একে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। সাহি-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াও, কিন্তু মামুদের উচ্চাভিলাষের তৃপ্তি হইয়াছিল না। তিনি তখন উত্তরাপথের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের এবং সমৃদ্ধ নগরনিচয়ের লুণ্ঠনে এবং ধ্বংস-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ধানেশ্বর, মথুরা, কাশুকুজ, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, সোমনাথ ক্রমে মামুদের ধনলোভ এবং পৌত্তলিকতা-বিষেধ-বিহ্বলে আহুতি রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ঘোর দুর্দিনে, উত্তরাপথের পূর্বাঙ্গের অধিপতি গৌড়াধিপ মহীপাল কি করিতেছিলেন ?

মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের ঔদাসীণের আলোচনা করিলে মনে হয়, কলিঙ্গজয়ের পর, মৌর্য-অশোকের শায়, [কাষোজায়জ

† Stein's Rajatarangini (English Translation); Sachau's English Translation of Alberuni's Indica, Vol. II.

‡ Raverty's Tabakat-i-Nasiri, pp. 21—22.

গোড়পতির কবল হইতে] বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল; এবং অশোকের শ্যায় মহীপালও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। রাঢ়দেশে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) “সাগরদীঘি”, এবং বরেন্দ্রে (দিনাজপুর জেলায়) “মহীপালদীঘি”, অদ্যাপি মহীপালের পরহিত-নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। তিনটি সুবৃহৎ নগরের উল্লেখ—বগুড়া জেলার অন্তর্গত “মহীপুর”, দিনাজপুর জেলার “মহীসন্তোষ”, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার “মহীপাল”—মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। ১০৮৩ সন্বতের (১০২৬ খৃষ্টাব্দের) সারনাথে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে,—গোড়াধিপ মহীপাল বারাণসীধামে, স্থিরপাল এবং বসন্তপালের ঘারা, ঈশান (শিব) ও চিত্রঘণ্টার (চূর্ণার) মন্দিরাদি [কীর্তিরত্নসত্যানি] প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন; যুগদাবের (সারনাথের) “ধর্ম্মরাজিকা” বা অশোকস্তূপ এবং অশোকের স্তম্ভোপরস্থিত “সান্ন-ধর্ম্মচক্রের” জীর্ণসংস্কার করাইয়াছিলেন; এবং অভিনব “শৈলগন্ধকুটী” নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

সারনাথের লিপিতে বারাণসীধামে মহীপালের কীর্তিকলাপের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠে স্বতঃই মনে হয়,—বারাণসী তখন গোড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে, গাহড়বাল-রাজগণের আমলে, বারাণসী কাশ্মীর-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু একাদশ শতাব্দে, বারাণসী কান্যকুব্জের প্রতীহার-রাজগণের অধিকারভুক্ত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, কাশ্মীর-রাজ রাজ্যপাল, সুলতান মামুদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন ঘোর বিপন্ন এবং স্বীয় রাজধানী-রক্ষণে অসমর্থ, তখন বারাণসী তাঁহার রক্ষণাধীনে থাকিলে, গোড়াধিপ যে তথায় শত শত কীর্তিরত্ন-প্রতিষ্ঠায় সাহসী হইতেন, এরূপ মনে হয় না। বারাণসী তখন গোড়রাজ্যভুক্ত এবং গোড়সেনা-রক্ষিত ছিল; এবং মহীপাল বারাণসী-রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই, হয়ত এই মহাতীর্থ সুলতান মামুদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল।*

* বেণ্ডল (Bendall) নেপাল-দরবারের পুস্তকাগারের একখানি হস্তলিখিত রামায়ণের (১০৭৭ নং) কিঙ্কিণ্যাকাণ্ডের উপসংহার-ভাগ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXXII, 1903, Part I. page 18):—
“সংবেৎ ১০৭৬ আষাঢ়বাসি ৪ মহারাজাধিষ্যাক পুণ্যাবলোক—সোমবংশোদ্ভব-গোড়ধনজ-শ্রীমৎ-গাণ্ডেয়দেব-ভূজ্যমান-তীরভুক্তৌ কল্যাণবিজয় রাজ্যে.....শ্রীগোপতিনা লেখদ্ম।”

বারাণসীধামকে কীর্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া, মহীপাল এমনই তদ্বয় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আৰ্য্যাবর্তের অপরাধের তীর্থক্ষেত্রের কীর্তিরত্নের কি দশা হইতেছিল, সে দিকে দৃকপাত করিবারও তাঁহার অবসর ছিল না। সারনাথের লিপি-সম্পাদনের ঠিক পূর্বে বৎসর [১০২৫ খৃষ্টাব্দে] মামুদ সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, এবং কয়েক বৎসর পূর্বে, [১০১৮ খৃষ্টাব্দে] মথুরা এবং কাশ্মকুঞ্জের মন্দিরনিচয় ভূমিসংগ করিয়া, সুবর্ণ এবং রক্তনির্মিত দেবমূর্তিসমূহ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সাহি-রাজ্যের পতনে, বা কাশ্মকুঞ্জ এবং কালঞ্জর রাজ্যের বিপদে না হউক, মথুরার গায় তীর্থক্ষেত্রের দেবমূর্তি এবং দেবমন্দির নিচয়ের দুর্দশায়, ধর্মপ্রাণ মহীপালের হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি স্বীয় রাজ্যের বহির্ভূত তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন। সুলতান মামুদের অভিযাননিচয় সম্বন্ধে গোড়াধিপ মহীপালের এই প্রকার ঔদাসীন্য উত্তরাপাথের সর্বনাশের অত্যন্ত কারণ। যদি মহীপাল গোড়রাজ্যের সেনাবল লইয়া সাহি-জয়পাল, আনন্দপাল, বা ত্রিলোচনপালের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেন, তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত।

॥ নয়পাল ॥

মহীপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী নয়পাল, [তৃতীয় বিগ্রহপালের ভাস্করশাসনে], “সকলদিকে প্রতাপ-বিস্তারকারী” এবং “লোকানুরাগভাজন”

বেঙ্গল সন্থ ১০৭৬ বিক্রম-সন্থ রূপে [১০১১ খৃষ্টাব্দ] গ্রহণ করিয়া, গোড়রাজ্যে গান্ধেয়-দেবকেও চেনীর কলচুরি-বংশীয় রাজা গান্ধেয়দেবকে অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। ১০১১ খৃষ্টাব্দে তীরভুক্তি বা ত্রিহত (মিথিলা) কলচুরি-রাজ গান্ধেয়দেবের পদানত ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইলে, তখন বারাণসীকে গোড়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যায় না। স্বরাসী পণ্ডিত লেডি, স্বরচিত নেপালের ইতিহাসে (*Levi's Le Nepal, Vol. II, p. 202, Note*, বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটীর সুযোগ্য পুস্তকরক্ষক বঙ্গবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র কুমার এই অংশ আমাকে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন), বেঙ্গলের উক্ত পাতের বিস্তৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বেঙ্গলের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেন নাই। “গোড়রাজ্য” বা গোড়-রাজ্যের পতাকা অর্থে গোড়াধিপকেই বুঝাইতে পারে। চেনীর কলচুরি-বংশীয় কোনও রাজা কর্তৃক কখনও গোড়াধিপ-উপাধি ধারণের প্রমাণ বিদ্যমান নাই। চেনীরাজ গান্ধেয়-দেবের সময়ে মগধ যে গোড়াধিপ মহীপালের পদানত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে, এবং মগধের পশ্চিম-দিগ-বর্তী জেজাকভুক্তি (যুশেলখণ্ড) চন্দেল-রাজ্যগণের অধিকৃত ছিল। সুতরাং মগধস্ত জেজাকভুক্তি ডিঙ্গাইয়া, চেনী-রাজ্যের পক্ষে মিথিলায় “কলাগবিজয়রাজ্য”-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। নেপালী-লেখক কর্তৃক উল্লিখিত এই সে:মবংশীয় গান্ধেয়দেব হরত মিথিলায় একজন সামন্ত নয়পাল ছিলেন।

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। নয়পাল যখন গোড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন সকল দিকে না হউক, পশ্চিম দিকে প্রতাপ-বিস্তারের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোন কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন,—মামুদ যখন কাশ্মুকুজ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন কাশ্মুকুজ-রাজ [রাজ্যপাল] তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, চন্দেল-রাজ গণ্ড তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।* কচ্ছপঘাট-বংশীয় বিক্রমসিংহের [ছবকুণ্ডে প্রাপ্ত] ১১৪৫ বিক্রম-সংবতের [১০৮৮ খ্রিস্টাব্দের] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, বিক্রমসিংহের প্রপিতামহ অজ্জুন, বিদ্যাধরের আদেশে [কার্যনিরতঃ], রাজ্যপাল নামক নয়পালকে নিহত করিয়াছিলেন।† এই বিদ্যাধর চন্দেল-রাজ গণ্ডের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর, এবং এই রাজ্যপাল কাশ্মুকুজের প্রতীহারবংশীয় রাজা রাজ্যপাল বলিয়া অনুমান হয়। মহোদয় প্রাপ্ত চন্দেল-বংশের একখানি শিলালিপিতে সম্ভবত বিদ্যাধর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি কাশ্মুকুজ-রাজের বিনাশবিধান করিয়াছিলেন, [বিহিত-কশ্মুকুজ-ভূপালভঙ্গম্]।** রাজ্যপালের হস্তা গণ্ডই হউন বা বিদ্যাধরই হউন, রাজ্যপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কার্যতঃ প্রতীহার-বংশের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। রাজ্যপালের পরে, ত্রিলোচনপাল এবং তৎপর সম্ভবত যশপাল কাশ্মুকুজের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতীহার-বংশের লুপ্ত-গৌরব পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং নয়পালের পশ্চিমদিকে রাজ্য-বিস্তারের বিশেষ সুযোগ ছিল। কিন্তু নয়পালও, মহীপাল এবং পালবংশের ইতিহাসের এই স্থিতিশীল যুগের অশ্রান্ত নয়পালগণের শ্রায়, “মহোদয়শ্রী”-উপার্জন-অভিলাষ-বজ্জিত ছিলেন।

পিতার শ্রায় নয়পালও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া, গোড়রাজ্য অখণ্ড রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। “তারিখ-ই-বাইহাকী” নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, মামুদের পুত্র

* Elliot's History of India, Vol. II, p. 463. মুসলমান লেখকগণ কালক্রমের রাজ্যকে নন্দা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দেল-রাজগণের শিলালিপি এবং তাম্রশাসনে প্রদত্ত বংশাবলী অনুসারে এই সময়ের কালক্রম-বাজের নাম “গণ্ড”। Epigraphia Indica, Vol. VIII, app. I, p. 16. উক্তবা।

† Epigraphia Indica, Vol. II, p. 237 :—

“শ্রীবিদ্যাধর-দেবকার্যনিরতঃ শ্রীরাজ্যপালং হৃষ্টাত্
কংঠাষি-হিমনেক্ষাণনিবহৈ হৃদ্বা মহত্যাধবে।”

** Epigraphia Indica, Vol. I, pp. 229-222.

মাসুদ যখন গজনীর অধীশ্বর, তখন [১০৩৩ খৃষ্টাব্দে] লাহোরের শাসনকর্তা আহম্মদ নিয়ালতিগীন্ বারাগসী-নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত “তারিখ”-প্রণেতা লিখিয়াছেন—*

“(নিয়ালতিগীন্ সসৈন্য) গঙ্গাপার হইয়া, বাম তীর দিয়া চলিয়া গিয়া, হঠাৎ বণারস নামক সহরে উপনীত হইলেন। (এই সহর) গঙ্গ-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সহর (পূর্বে) কখনও মুসলমান সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। সহরটি ২ ফরসঙ্গ (৬০০০ গজ) দীর্ঘ এবং ২ ফরসঙ্গ প্রশস্ত। (এখানে) জল যথেষ্ট ছিল। মুসলমান লস্কর প্রাতঃকালে (পঞ্চাঙ্ঘিয়া) ত্রিতীয় নমাজের (মধ্যাহ্নের) পরে, আর অধিক কাল তথায় তিষ্ঠিতে পারিয়াছিল না; কারণ বিপদের (আশঙ্কা) ছিল। (এই সময় মধ্যে) কাপড়ের বাজার, সুগন্ধিদ্রব্যের বাজার, এবং মণিমুক্তার বাজার—এই তিনটি বাজার ব্যতীত, আর কোন স্থান লুণ্ঠন করিতে পারা গিয়াছিল না। কিন্তু সৈন্যগণ খুব লাভবান হইয়াছিল। সকলেই সোণা, রূপা, আতর, এবং মণিমুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অভিলাষ পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।”

“তারিখ-ই-বাইহাকি”-প্রণেতা আবুল ফজল, সুলতান মাসুদ এবং আহম্মদ নিয়ালতিগীনের সমসাময়িক লোক, এবং নিয়ালতিগীনের অভিযান সম্বন্ধে ঋীটি খবর সংগ্রহের তাঁহার বেশ সুবিধা ছিল। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ১০৩৩ খৃষ্টাব্দেও বারাগসী পূর্বেও সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু সুলতান মাসুদের মৃত্যুর পর, বারাগসীর প্রহরীগণ কিছু অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই নিয়ালতিগীন্ বঙ্গনীযোগে চলিয়া আসিয়া, হঠাৎ প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া, ছয় ঘণ্টা কাল মধ্যে তিনটি বাজার লুণ্ঠনের অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নগর-রক্ষীগণ খবর পাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং, নিয়ালতিগীন্ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে নিয়ালতিগীনের আক্রমণ হইতে যাঁহারা বারাগসীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার নয়পালের আদেশানুবর্তী গোড়-সেনা, নিঃসন্দেহে একরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

তিক্ততীয় ভাষায় রচিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (অতীশের) জীবনচরিতে, নয়পালের আমলে, “কর্ণা”-রাজ্যের রাজা কর্তৃক মগধ-আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। * নয়পাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ

† Tarikh-i-Baihaki (Bibliotheca Indica), p. 497 ; Elliot's History of India, Vol. II, pp. 123-124.

* Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I, 1903, pp. 9-10.

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গোড়সেনা “কর্ণা”-রাজের সেনা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, এবং শক্রগণ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু পরে নয়পালই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে, উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবন-চরিতকার বৃন্তন তাঁহার নিজের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং বৃন্তনের প্রদত্ত মগধ-আক্রমণ-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কোন্ রাজ্যকে যে বৃন্তন “কর্ণা” নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিরূপণ করা কঠিন। “কর্ণা”-শব্দ যদি রাজ্যের নাম রূপে গ্রহণ না করিয়া, রাজ্যের নাম বলিয়া মনে করা যায়, তবে এই সমস্যা পূরণ করা যাইতে পারে। চেন্দীর কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ নয়পালের জীবদ্দশায়, [১০৩৭ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে,]* পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণের পৌত্রবধূ অহলনাদেবীর [ভেরঘাটে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ণের ভয়ে “কলিঙ্গের সহিত বন্ধ সম্পন্ন ছিল।”‡ অহলনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের [কর্ণবলে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে সূচিত হইয়াছে—গোড়াধিপ কর্ণ ত্যাগ করিয়া কর্ণের আজ্ঞাবহন করিতেন।‡ কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজস্ববর্গের সহিত বিরোধ রত ছিলেন। সুতরাং নয়পালের সময়ে মগধ-আক্রমণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে; এবং সেই আক্রমণের পরিণাম সম্বন্ধে বৃন্তন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হয়ত ঠিক।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ সত্ত্বেও, গোড়াধিপ নয়পাল গোড়-রাজ্যের মান-মর্যাদা-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে উৎকীর্ণ, গয়ার কৃষ্ণ-দ্বারকা-মন্দিরের শিলালিপিতে, তিনি “সমস্ত-ভূমণ্ডল-রাজ্যভার”-বহনকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

॥ তৃতীয় বিগ্রহপাল ॥

নয়পালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃতীয় বিগ্রহপাল, তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসরে উৎকীর্ণ [আমগাছিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে, “শক্রকুল-কালরুদ্ধ” এবং “বিষ্ণু অপেক্ষাও অধিক সংগ্রাম-চতুর” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। § সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিতে” তৃতীয় বিগ্রহপালের সংগ্রাম-চতুরতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন

† Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. I.

‡ Ibid, Vol. II, p. 11.

§ Indian Antiquary, Vol. XVIII, p. 217.

(১১৯) :—“বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি [কলচুরি] কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন না : তাঁহার দুহিতা যৌবনক্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।” বিবাদপ্রিয় কর্ণই, সম্ভবত নয়পালের মৃত্যুর পর, আবার গোড়-রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া, পরাভূত হইয়া কণ্ঠাদান করিয়া, গোড়াধিপের প্রীতি অর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলেই, আর এক বহিঃশত্রু আসিয়া, পাল-বংশের অধঃপতনের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অভিনব শত্রু, কল্যাণের * চালুক্যরাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের (রাজত্ব ১০৪০-১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) দ্বিতীয় পুত্র, বিক্রমাদিত্য। কুমার বিক্রমাদিত্য, পিতার আদেশক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, গোড় এবং কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিহ্লন “বিক্রমাক্ষদেব-চরিতে” (৩৭৪) এই দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন :—

গায়ন্তি স্ম গৃহীত-গোড়-বিজয়-স্তম্ভেরমস্যাংহবে
তস্যোন্মূলিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানু-স্যান্দন-চক্রঘোষ-ভূষিত-প্রত্যাঘনিদ্রারসাঃ
পূর্বাদ্বেঃ কটকেমু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুদ্ধং যশঃ ॥†

“সূর্যের রথচক্রের শব্দে প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ-বনিতাগণ পূর্বাদ্রির কটদেশে, যুদ্ধে গোড়ের বিজয়হস্তী-গ্রহণকারী এবং কামরূপাধিপতির বিপুল-প্রতাপ-উন্মূলনকারী কুমার বিক্রমাদিত্যের তুষারশুভ্র যশ গান করিয়াছিল।”

কুমার বিক্রমাদিত্য, উত্তরকালে যখন “ত্রিভুবনমল্ল পরমাড়িদেব” উপাধি গ্রহণ করিয়া, কল্যাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, (১০৭৭-১১২৫ খৃষ্টাব্দ) তখন বিহ্লন কাশ্মীর হইতে আসিয়া, তাঁহার সভার “বিদ্যাপতির” বা প্রধান পণ্ডিতের পদলাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি বিহ্লনের এই গোড়-কামরূপ-বিজয়-কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও, একেবারে অমূলক নহে। বিহ্লন “বিক্রমাক্ষদেব-চরিতে” (১৮১০২) স্বীয় প্রভুকে “কর্ণাটেন্দু” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এবং কহ্লণ “রাজতরঙ্গিণীতে” (৭১৩৬) বিহ্লনের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, ত্রাহাতে “পরমাড়ি-ভূপতি” বা বিক্রমাদিত্যকে

* নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত বর্তমান কল্যাণী।

† “বিক্রমাক্ষদেবচরিতম্,” Edited by George Buhler, Bombay, 1875.

“কর্ণাট” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ সুতরাং কর্ণাট বলিতে তৎকালে যে কল্যাণের চালুক্যগণের রাজ্য বুঝাইত, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। গৌড়ের সেন-রাজগণের শিলালিপিতে এবং তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময়ে গৌড়-রাজ্যের একাংশের [রাঢ়ের] সহিত কর্ণাট-রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেনবংশের প্রথম নরপতি বিজয়সেনের দেবপাড়া-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন “একাজ (এক প্রকার) সেনা লইয়া, অরিকুলাকীর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারি দ্রুত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন” (৮ শ্লোক); এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্ড্রাশ্রমনিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন (৯ শ্লোক)। আবার বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের [কাটোয়ায় প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—“চন্দ্রবংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;... তাঁহারা সদাচারপালন-খ্যাতিগর্বে রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্বক প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ শ্লোক)।” এই রাজপুত্র-গণের বংশে “শক্র-সেনা-সাগরের প্রলয়-তপন সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৪ শ্লোক)।” এই উভয় বিবরণে আপাতত বিরোধ দেখা যায়। প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্তসেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে, বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায়, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা রাঢ়-নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্যকালীন লিপিতে এত বিরোধ-কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট-রাজ্যের পদানত ছিল, এবং কর্ণাট-রাজ কর্তৃক রাঢ়-শাসনার্থ নিয়োজিত, [লক্ষণসেনের মাধাইনগর-তাম্রশাসনে কথিত] “কর্ণাটক্ষত্রিয়”-বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশেই কর্ণাটরাজ্যের শক্রগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলে এই বিরোধের ভঙ্গন হয়। বিহলন-বিহৃত চালুকা-রাজকুমার বিক্রমাদিত্য কর্তৃক গৌড়াধিপের এবং [হয়ত গৌড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত] কামরূপাধিপের পরাজয়-বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দ্র-রাজ কীর্তিবর্মার (রাজত্ব ১০৪৯-১১০০ খৃষ্টাব্দ) আশ্রিত “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়”-রচয়িতা কুম্ভমিশ্র যাহাকে “গৌড়-রাস্ত্রমন্তমং নিরুপমা ভদ্রাপি রাঢ়া” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢ়দেশ গৌড়-রাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া-

‡ কাম্বীয়েভ্যো বিনির্ধ্যান্তং রাজ্যে কলশভূপতেঃ ।

বিদ্যাপতিঃ ষং কর্ণাটক্ষেত্রে পর্যাড়িভূপতিঃ ॥

ছিলেন। নবজিত রাঢ়-শাসনার্থ কর্ণাট-রাজ্য যে রাজপুত্র বা ক্ষত্রিয় সেনা-নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাঁহারই বংশধর। সামন্তসেন একাদশ শতাব্দের চতুর্থপাদে বিদ্যমান ছিলেন, একথা স্বীকার করিলেই, এই অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণের আর আপত্তি থাকে না। সামন্তসেন যে একাদশ শতাব্দের শেষপাদেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সেন-রাজ্যগণের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে।

॥ রামপাল ॥

মহাপাল, শূরপাল, এবং রামপাল; এই তিন পুত্র বর্তমান রাখিয়া, তৃতীয় বিগ্রহপাল পরলোক গমন করিয়াছিলেন। “রামচরিত”-কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্রের এবং পৌত্রগণের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।* “রামচরিত”-রচয়িতা সঙ্ঘাকর নন্দী বরেন্দ্রী-মণ্ডলে “শ্রীপৌণ্ড্র বর্ধনপুর-প্রতিবন্ধ” ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী পাল-নরপালের “সাক্ষি [বিগ্রহিক] বা সন্ধি এবং যুদ্ধ বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। সঙ্ঘাকর “রামচরিতের” উপসংহারে (৪১৪) প্রার্থনা করিয়াছেন, [রামপালের দ্বিতীয় পুত্র] রাজা মদন [পাল] “চিরায় রাজ্যং কুরুতাং”। সুতরাং “রামচরিত” তুল্যকালীন কবির রচিত ঐতিহাসিক কাব্য। সঙ্ঘাকর নন্দী “কবি-প্রশস্তিতে” এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“অবদানম্ রঘুপরিবৃঢ়-গোড়াধিপ-রামদেবযো রেতং ।

কলিয়ুগ-রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল-বাল্মীকিঃ ॥১১॥”

“রঘুপতি রামের এবং গোড়াধিপ রাম [পালের] এই চরিত কলিয়ুগের রামায়ণ, এবং [এই কাব্যের] কবিও কলিকালের বাল্মীকি।”

“রামচরিতের” প্রথম পরিচ্ছেদের সমস্ত শ্লোকের (১-৫০) এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১-৩০ শ্লোকের টীকা আছে; কিন্তু অবশিষ্ট অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই। কবি মূল শ্লোকে ঐতিহাসিক ঘটনার একরূপ সামান্য আভাস দিয়াছেন যে, টীকা ব্যতীত তাহা বুঝা কঠিন। “রামচরিত হইতে ইতিহাসের উপাদান আহরণে টীকাই আমাদের প্রধান আশ্রয়। সুতরাং যে অংশের টীকা নাই, সেই অংশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য-গ্রহণ দুঃসাধ্য।

“রামচরিতে” বর্ণিত হইয়াছে—(তৃতীয়) বিগ্রহপাল পরলোক গমন করিলে, (দ্বিতীয়) মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া, চক্ষুর্ধারণত

* Ramacharita by Sandhyākara Nandi, Edited by Mahāmaho-
pādhyāya Haraprasād Sāstri M, A. (Memoirs of the A. S. B., Vol., III,
No, 1).

[অনীতিকারমুক্ত] হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শুরপালকে এবং রামপালকে লোহ-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া, কারাগারে নিষ্কেপ করিয়াছিলেন। তখন কৈবর্ত-জাতীয় দিবা বা দিব্বোক, যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া, “জনকভূ” বা পাল-রাজগণের জন্ম-ভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন (১১২৯, ৩১-৩৯), এবং দিব্বোকের অনুজ রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে অধিকৃত হইয়াছিলেন (১১৪০)। বরেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া, গৌড়-রাজ্যের অর্ধাংশ প্রদেশের সামন্তগণকে একত্রিত করিবার জন্ম, রামপাল রাঢ়-অঙ্গ-মগধাদি প্রদেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং বরেন্দ্রীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্ম, মহাপ্রতীহার শিবরাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে সামন্ত-চক্র রামপালের সহিত মিলিত হইয়াছিল। মগধের অন্তর্গত পীঠির রাজা দেবরক্ষিতের পরাভবকারী [রামপালের মাতুল] রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মথন বা মহন সামন্তগণের অগ্রণী ছিলেন। মহনের পুত্র কাফু-রদেব এবং সুবর্ণদেব, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবরাজ, তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন (২১৮)। “রামপালচরিত্তের” টীকাকার সামন্তগণের মধ্যে এই সকলের নামোল্লেখ করিয়াছেন; (২১৫)— কান্তকুঞ্জ-রাজের সেনা-পরাভবকারী পীঠিপতি (মগধাধিপ) ভীমযশা, দক্ষিণদেশের রাজা বীরগুণ, উৎকলেশ কর্ণকেশরীর সেনাধ্বংসকারী দণ্ডভুক্তি-ভূপতি জয়সিংহ, দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ, অপর-মন্দারপতি সমস্ত-আরণ্য-সামন্তচক্র-চূড়ামণি লক্ষ্মীশূর, শুরপাল, তৈলকম্প-পতি রুদ্রশেখর, উচ্ছাল-পতি ময়গলসিংহ, ডেকরীয়-রাজ প্রতাপসিংহ, কয়লপতি নরসিংহাজ্জুন, সঙ্কট-গ্রামীয় চণ্ডাজ্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাধীপতি হোরপবর্দ্ধন এবং পদুবরা-পতি সোম।

এই মহাবাহিনী লইয়া, রামপাল নৌকায় গঙ্গাপার হইয়াছিলেন। পাল-রাজের সেনার সহিত কৈবর্ত-রাজের সেনার ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে করিপুষ্ঠে অবস্থিত ভীম বন্দী হইয়াছিলেন (২১১২-২০)। এই উপলক্ষে সঙ্ক্যাকর এক পক্ষে সাগর এবং অপর পক্ষে ভীমের চরিত্তের বর্ণনা করিয়াছেন। স্নেহের অনুরোধেই হউক, আর সত্যের অনুরোধেই হউক, ভীমের চিত্র উচ্ছল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। সাগরের দ্বায় ভীমও “লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ের আবাস” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভীমকে নৃপতি রূপে প্রাপ্ত হইয়া, “বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিয়াছিল,” এবং “সঙ্কটগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিল। ভবানীর সহিত ভবানীপতি অধর্মান্যাত্ম্যগী রাজা ভীমের উপাশ্রয় দেবতা ছিলেন (২১২১-২৭)।

॥ কৈবর্ত-বিদ্রোহ ॥

সম্রাটের নন্দী-বর্ণিত এই প্রজা-বিদ্রোহের কিছু কিছু আভাস তৎকালের তাম্রশাসনে এবং শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে রামপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (৪ শ্লোক) :—

“মুদ্র-সাগর লঙ্ঘন করিয়া, ভামরূপ রাবণ বধ করিয়া, জনকভূ উদ্ধার করিয়া, রামপাল ত্রিজগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশ বিস্তার করিয়াছিলেন।”
— “রামপালচরিতের” টীকাকারের মতানুসারে, “জনকভূ” বরেন্দ্রী-অর্থে গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকেও কৈবর্ত-বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে সারনাথের ভগ্নস্তূপের একাংশ খননকালে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে * “রামপালচরিতে” উল্লিখিত কয়েক জন পাত্রের এবং কোন কোন ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কাণ্ডকুঞ্জের গহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের অন্ততমা মহিষী কুমারদেবী কর্তৃক একটি বৌদ্ধবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, — “পীঠিকা”র বা “পীঠি”র দেবরক্ষিত নামক এক জন রাজা ছিলেন।

“গোড়ে গৈতীয় যোদ্ধা, ধনুর্ধর (?), ক্ষত্রকুলের একমাত্র চূড়ামণিঃ

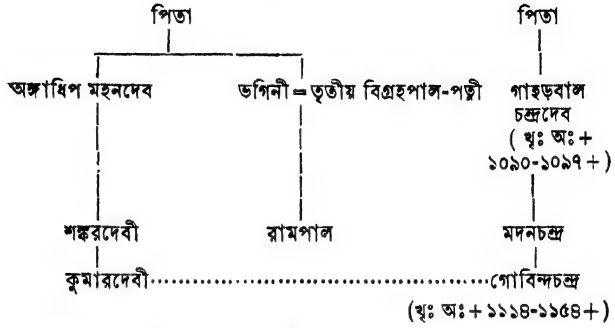
প্রখ্যাতো মহাপ্রাণপঃ ক্ষিত্তিজ্জাম্মাত্তো ভবন্যাতুলঃ।

তং জিত্বা মুখি দেবরক্ষিতমখাং শ্রীরামপালস্য যো

লক্ষ্মীং নিজিত-বৈরি-রোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম্ ॥”

“গোড়ে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, ধনুর্ধর (?), ক্ষত্রকুলের একমাত্র চূড়ামণি, নরপালগণের সম্মানার্থে মাতুল, মহন নামক অঙ্গপতি ছিলেন। তিনি দেব-রক্ষিতকে পরাজিত করিয়া, শত্রুর বাধা বিদূরিত হওয়ায়, অধিকতর উজ্জল শ্রীরামপালের রাজলক্ষ্মী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।”

“রামপালচরিতে” [২।৮ শ্লোকের টীকায়] রামপালের মাতুল মহন কর্তৃক পীঠিপতি দেবরক্ষিতের পরাজয় উল্লিখিত হইয়াছে। কুমারদেবীর এই শিলালিপির সাহায্যে রামপালের রাজত্বের সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে,— মহনদেব শঙ্করদেবী নাম্নী দুহিতাকে পীঠিপতির করে অর্পণ করিয়াছিলেন। কুমারদেবী এই শঙ্করদেবীর কন্যা, এবং গোবিন্দ-চন্দ্রের মহিষী। কুমারদেবী এবং গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলী পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়,—



অর্থাৎ মহনদেব গাহড়বাল-রাজ চন্দ্রদেবের সমকালবর্তী ছিলেন। মহনদেব এবং রামপাল, সম্পর্কে মামা-ভাগিনেয় হইলেও উভয়ে সম্ভবত সমবয়সী ছিলেন। “রামপালচরিতে” উক্ত হইয়াছে (৪৮-১০ শ্লোক), মহনদেব (মখন) পরলোক গমন করিয়াছেন, শুনিয়া, “মুদিগরিতে” (মুদ্বেরে) অবস্থিত রামপাল গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করত তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামপাল কাশ্যকুঞ্জ-রাজ চন্দ্রদেবের সমসাময়িক, এবং একাদশ শতাব্দের শেষপাদ পর্য্যন্ত গোড়-রাজ্যের রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

“রামপালচরিতের” যে অংশে ভীমের বন্ধনের পরবর্ত্তী ঘটনা সকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহার টীকা নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে, ভীম ধৃত হইলে, তদীয় সুহৃৎ হরি, ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহী সেনা পুনঃ সম্মিলিত করিয়া, মুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভীষণ মুদ্বের পর, হরি ধৃত এবং নিহত হইয়াছিলেন। ভীমও সম্ভবত নিহত হইয়াছিলেন। এই রূপে বিদ্রোহানল নির্বাপিত হইলে, পালবংশের জন্মভূমি [জনকভূ] আবার পাল-নরপালের হস্তগত হইয়াছিল।

বিদ্রোহ দমন করিয়া, রামপাল “রামাবর্তী” নামক এক নূতন নগর নির্মাণ করিয়া, বরেন্দ্রভূমির শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি এক দিকে যেমন অভিনব নগর-নির্মাণে রত ছিলেন, আর এক দিকে তেমনি নষ্টপ্রায় গোড়-রাজশক্তির পুনরুজ্জীবন-সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। সঙ্ঘাতকর লিখিয়াছেন, —পূর্বদিকের এক জন নরপতি, পরিজ্ঞাপ পাইবার জন্ত, রামপালকে বর-বারণ, নিজের রথ এবং বর্ষ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

“নরপরিজ্ঞাপ-নিমন্তং পত্যা যঃ প্রাপিংশীয়েন।

বর-বারণেন চ নিজ-শ্রম্ভন-দানেন বর্ষণারাধে ॥’০৪৪॥

বরেন্দ্রবাসী সন্ন্যাসকর যঁাহাকে “প্রাগ্দিশীষ” বলিয়াছেন, তিনি সম্ভবত বাঙ্গালার পূর্বে সীমান্তের কোন পার্বত্য-প্রদেশের নৃপতি। রামপাল কামরূপ জয় করিয়া, গোড়রাষ্ট্রভুক্ত করিয়াছিলেন [“বিগ্রহনির্জিতকাম-রূপভূৎ”]। এই কামরূপ-জয় যে সন্ন্যাসকর নন্দীর কল্পনা-প্রসূত নহে, কুমারপালের প্রসঙ্গে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। রামপাল উৎকলে এবং কলিক্লেও স্বীয় প্রাধিক্ত-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসকর নন্দী লিখিয়াছেন—

‘ভবভূষণ-সম্ভতিভুবমনুজগ্রাহ জিতমুংকলত্রং যঃ।

জগদবতিস্ম সমস্তং কলিক্ততস্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্ ॥’ ৩।৫৫ ॥

“ভবভূষণ (চন্দ্রের) সম্ভতির রাজ্য উৎকল জয় করিয়া, তৎপ্রতি যিনি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং চৌরগণকে নিহত করিয়া, কলিক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।”

রামপাল যখন গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন গঙ্গ-বংশীয় অনন্তবর্মা-চোড়গঙ্গ [রাজত্ব ১০৭৮-১১৪২ খৃষ্টাব্দ] কলিক্তের রাজা ছিলেন, এবং তিনিই উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন। গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণ চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত ছিলেন।* সুতরাং এ স্থলে সন্ন্যাসকর নন্দী চোড়-গঙ্গকে স্মরণ করিয়াই, উৎকলকে “ভবভূষণ-সম্ভতিভূ” বলিয়াছেন।† কিন্তু রামপাল কর্তৃক চোড়-গঙ্গের এই পরাজয়-কাহিনী কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে চোড়-গঙ্গ সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন। গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—চোড়-গঙ্গ গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরবর্তী

* অজনি রজনিকানি-বংশচূড়া-

মণিরণিমাণি-গুণেন চোড়-গঙ্গঃ ॥

Inscription of Svapnesvara, Verse 7, Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 200.

† “রামচরিতের” ভূমিকার শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—“He (Rāmapāla) conquered Utkala and restored it to the Nāgvamsis” ইহা ষায়া বুঝা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় “ভবভূষণ-সম্ভতি”-পদ “নাগবংশী”-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। নাগ ভবের (শিবের) ভূষণ হইলেও, নাগবংশীয় কোন রাজা উড়িষ্যার কখনও রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পঞ্চাশতের “রামচরিতের” (২।৫) টীকা হইতে জানা যায়, রামপালের বাঙ্গালাভের অব্যবহিত পূর্বে, উৎকলে “কেশরী”-উপাধিধারী একজন নৃপতি ছিলেন। ভীমের সহিত যুদ্ধোত্তর রামপালের সহিত ষায়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে “উৎকলেপ কর্ণকেশরী”র পরাভবকারী দণ্ডভুক্তি-ভূপতি জয়সিংহের নাম দৃষ্ট হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে “মন্দারাধিপতিকে” পরাজিত এবং আহত করিয়াছিলেন। † এই সূত্রেই হয়ত কলিঙ্গ-পতির সহিত গোড়-পতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিঙ্গ-পতিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। চোড়-গঙ্গের অতি দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের প্রথম ভাগে, তাঁহাকে রামপালের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই সময়, গোড়াধিপের নিকট মস্তক অবনত করা অসম্ভব নহে ; এবং রামপালের মৃত্যুর পর, হয়ত চোড়-গঙ্গ প্রবলতর হইয়াছিলেন। সক্ষ্যাকর নন্দী যে সত্যের অপলাপ করেন নাই, কুমারদেবীর সারনাথের শিলালিপি এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষাদান করিতেছে। সুতরাং বর্ণিত রামপালের কলিঙ্গ-জয়-কাহিনী অমূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। রাত্বে অবশ্য রামপাল কর্ণাট-রাজের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি-অনুসারে, সামন্তসেন যে সকল কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুহৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা গোড়াধিপেরই সেনা। সামন্তসেন এই সকল “দুহৃত্তগণকে” বিনাশ করিয়াও, রাঢ়ে কর্ণাট-রাজের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়া, হয়ত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহানল নির্বাণ করিয়া, এবং কামরূপ ও কলিঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, রামপাল যে গোড়রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই অভিনব গোড়রাজ্যের সহিত রামপালের পূর্বপুরুষগণের শাসিত গোড়রাজ্যের অনেক প্রভেদ ছিল। প্রজাসাধারণের নির্বাচিত গোড়াধিপ গোপালের গোড়রাজ্য, প্রজার প্রীতির এবং প্রজাশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হতভাগ্য দ্বিতীয় মহীপালের “অনীতিকারসত্ত্বের” ফলে, এবং দিব্বোক-নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহানলে, সেই ভিত্তি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। রামপালের পক্ষে, গোড়রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনরায় একত্রিত করিয়া; উহার পুনর্গঠন সম্ভব হইলেও, সেই দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা,—সেই ভগ্ন অট্টালিকার বহিরঙ্গের সংস্কার সম্ভব হইলেও,—উহার নষ্টভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং রামপালের মৃত্যুর পরই, আবার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে, বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্তু রামপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র “গোড়েশ্বর” কুমারপালের, এবং তাঁহার প্রধান-সচিব এবং সেনাপতি, বৈদ্যদেবের বাহুবলে, গোড়রাজ্যের পতন আরও কিছু কালের জন্য স্থগিত রহিল। বৈদ্যদেবের [কমৌলিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে বৈদ্যদেব কর্তৃক [অনন্তর বঙ্গে] দক্ষিণবঙ্গে, নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ-প্রসঙ্গে, পুনরায় বিদ্রোহ সূচিত হইয়াছে

(১১ শ্লোক)। এই সময়ে কামরূপের সামন্ত-নরপতিও বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে—

“পূর্বদিগ্ভাগে বহুমান-প্রাপ্ত তিম্গাদেব-নৃপতির বিদ্রোহ-বিকার শ্রবণ করিয়া, গোড়েশ্বর তাঁহার রাজ্যে এইরূপ [গুণগ্রাম-সমন্বিত] বিপুল কীৰ্ত্তিসম্পন্ন বৈদ্যদেবকে নরেশ্বর-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মার্ত্তণ্ড-বিক্রম বিজয়শীল সেই বৈদ্যদেব [আপন] তেজস্বী প্রভুর আজ্ঞাকে মালাদানের শ্রায় মস্তকে ধারণ করিয়া, কতিপয় দিবসের দ্রুত-রণযাত্রার [অবসানে] নিজ ভুঞ্জবলে সেই অবনিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পর, [তদীয় রাজ্যে] মহীপতি হইয়াছিলেন (১৩—১৪ শ্লোক)।”

॥ মদনপাল ॥

কুমারপালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র [তৃতীয়] গোপাল গোড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মদনপালের তান্ত্রশাসন (১৭ শ্লোক) পাঠে অনুমান হয়,—তৃতীয় গোপাল যখন রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, তখনও তিনি শৈশবের সীমা অতিক্রম করেন নাই। সঙ্ঘাতকর নন্দী লিখিয়াছেন—

“অপি শত্রুশ্লোপায়াদ্গোপালঃ স্বর্জগাম তৎসূনুঃ।”

“তাঁহার [কুমারপালের] পুত্র গোপাল শত্রুশ্লোপায়-হেতু স্বর্গ গমন করিয়াছিলেন।”

“শত্রুশ্লোপায়ের” [শত্রুহননকারীর উপায়ের] উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তৃতীয় গোপাল, যুদ্ধে বা ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, রামপালের [মদনদেবীর গর্ভজাত] পুত্র মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মদনপালের রাজ্যের অষ্টম বৎসরে সম্পাদিত [মনহলিতে প্রাপ্ত] তান্ত্রশাসনে, প্রশস্তিকার (১৮ শ্লোক) তাঁহার শৌর্য্যবীর্যের কোন পরিচয় দেন নাই। ইহাতে অনুমান হয়, মদনপাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমারপালের বা পিতা রামপালের শ্রায় সমরকুশল ছিলেন না। রাজা দুর্বল হইলে, পতনোন্মুখ রাজ্যের যে অবস্থা হয়, মদনপালের সময় গোড়রাজ্যেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। গোড়রাজ্যের বিভিন্ন অংশ গোড়পতির হস্তচ্যুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কামৌলীতে প্রাপ্ত তান্ত্রশাসনে বৈদ্যদেবকে “মহারাজা-ধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক” উপাধিতে ভূষিত দেখিয়া মনে হয়, বৈদ্যদেব কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসনের একটি শ্লোকের সাহায্যে, কুমারপালের এবং মদনপালের কাল নিরূপিত হইতে পারে। এই তান্ত্রশাসনের ২৮ শ্লোকে উক্ত

হইয়াছে,—“মহারাজ বৈদ্যদেব বৈশাখে বিম্ববৎ-সংক্রান্তিতে একাদশী তিথিতে” ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত আর্থার ভিনিস্ দেখাইয়াছেন, [১০৬০ হইতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে] ১০৭৭, ১০৯৬, ১১২৩, ১১৪২ এবং ১১৬১ খৃষ্টাব্দে একাদশী তিথিতে, এবং ১১১৫ এবং ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশী তিথিতে মেম-সংক্রান্তি হইয়াছিল।* এই সকল সালের মধ্যে, কোনও সালে বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। যে যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া, ভিনিস্ সাল (১১৪২ খৃঃ-অঃ) নির্বাচন করিয়াছেন, তাহা আর এখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, কুমরদেবীর সারনাথের শিলালিপি প্রতিপাদন করিতেছে—রামপাল ঋষীয় একাদশ শতাব্দের শেষপাদে গোড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সুতরাং, রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালের রাজত্ব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপন করিতে হইবে। কুমারপাল যে দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, বা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, তাঁহার মৃত্যুকালে, তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোপাল শৈশবের সাম্য অতিক্রম করিয়াছিলেন না। সুতরাং ১১১৫ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাই সম্ভব। এই তান্ত্রশাসন “সং ৪” বা বৈদ্যদেবের কামরূপে রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল। কুমারপাল বৈদ্যদেবকে হৃত ১১১২ খৃষ্টাব্দে কামরূপের রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং কুমারপালের মৃত্যুর এবং তৃতীয় গোপালের হত্যার পরে, [আনুমানিক ১১১৪ খৃষ্টাব্দে] মদনপাল সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কুমারপালের পরই বৈদ্যদেব স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসন ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ ভিনিস্ কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—এই লিপির “অক্ষরের সহিত বিজয়সেনের দেবপাড়া-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু (বিজয়সেনের লিপির অক্ষরের অপেক্ষা এই লিপির অক্ষরের) বর্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সাদৃশ্য আরও অধিক।” বিজয়সেনের লিপির অক্ষরের সহিত বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসনের অক্ষর মিলাইলে, কথ্যটা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।** দেবপাড়ার শিলালিপির ত, ন, ম, র এবং স বর্তমান বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ; কিন্তু বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসনের ত, ন, ম, র এবং স পুরাতন ঢঙ্গের। সুতরাং অক্ষরের হিসাবে, বৈদ্যদেবের তান্ত্রশাসনকে দেব-

* Epigraphia Indica, Vol. II, p. 349.

** Cunningham's Archæological Survey Report, Vol. III, p. 125.

পাড়ার শিলালিপির কিছুকাল পূর্বে স্থাপন না করিয়া উপায় নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দে, বর্তমান বঙ্গাঙ্করের উদ্ভবকালে, যে লিপিতে আধুনিক বঙ্গাঙ্করের সংখ্যা যত বেশী লক্ষিত হয়, সেই লিপিকে তত আধুনিক মনে করাই সঙ্গত।

লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকটবর্তী জয়নগর গ্রামে প্রাপ্ত একখানি শিলাখণ্ডে “যে ধর্মা” ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র এবং “শ্রীমন্ মদনপালদেব-রাজ্যে সন্থং ১৯ আশ্বিন ৩০” উৎকীর্ণ রহিয়াছে। † মদনপালের রাজ্যের ১৯ সন্থতের বা ১১৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই, সম্ভবত বর্ষা-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গ স্বাভিত্ত্য অবলম্বন করিয়াছিল, এবং সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন গোড়রাষ্ট্রের কেন্দ্র বরেন্দ্র-মণ্ডলে সেনরাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

॥ গোবিন্দপাল ॥

মগধে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে মহেন্দ্রপাল এবং গোবিন্দপাল নামক আরও দুই জন পাল-নরপালের পরিচয় পাওয়া যায়। শিলালিপিতে এবং তাম্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নামের অন্তে, ‘দেব’-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দুইখানি শিলালিপিতে মহেন্দ্রপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই মহেন্দ্রপালকে “মহেন্দ্রপালদেব” বলা হয় নাই। ‡ ইহাতে মনে হয়, মহেন্দ্রপাল পাল-নরপালগণের বংশ-সম্ভূত এবং তাঁহাদের স্থলবর্তী নাও হইতে পারেন। কিন্তু গোবিন্দপালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, তিনি পাল-রাজগণের বংশোদ্ভব এবং পালবংশের শেষ নৃপতি। নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি হস্তলিখিত “অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতা” গ্রন্থের সমাপ্তি-বাক্যের পরে লিখিত আছে,—“পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক-পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদগোবিন্দপালবিজয়-রাজ্য-সন্থং ৪ ॥” এই পুস্তকের লেখায় ব্যবহৃত অঙ্করের মধ্যে ত, ন, ম এবং র দেবপাড়ার শিলালিপির ত, ন, ম এবং র-এর মত বর্তমান বঙ্গাঙ্করের টঙ্গের। § গয়ার একখানি শিলালিপি হইতে গোবিন্দপালের রাজ্যের অবসানকাল নিরূপণ করা

† Cunningham's Archæological Report, Vol. III, pp. 123-124.

‡ Cf. Epigraphia Indica, Vol. 1, plate 19, and the same Vol. II, plates 29—33.

§ The Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, Vol. VIII (1876), p. 3 and plate 2. [Cowell and Eggeling's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the possession of R. A. S.]

যায়। এই শিলালিপির সম্পাদন-কাল সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে,—“সম্বৎ ১২৩২ বিকারি-সম্বৎসরে শ্রীগোবিন্দপালদেব-গতরাজ্যে চতুর্দশ-সম্বৎসরে গয়ায়াং ॥” * ১২৩২ বিক্রম-সম্বৎ বা ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের চতুর্দশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১১৬১ খৃষ্টাব্দে, গোবিন্দপালের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। গোবিন্দপাল বা তাঁহার পূর্ববর্তী নৃপতি হইতে বিজয়সেন কর্তৃক বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়া, মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২০২ বিক্রম-সম্বতে [১১৪৬ খৃষ্টাব্দে] কাশ্যকুঞ্জেশ্বর গোবিন্দচন্দ্র মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কারণ, গোবিন্দচন্দ্রের এই সালের একখানি তাম্রশাসনে† উল্লিখিত হইয়াছে, উহা মুদগগিরি বা মুঙ্গেরে সম্পাদিত হইয়াছিল। নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তকের উপসংহারে লিখিত আছে, ‡—“পরমেশ্বরেতাদি রাজাবলী পূর্ববৎ শ্রীমদগোবিন্দপাল-দেবানাং বিনয়রাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎসরেভিলিখ্যমানো।” এ স্থলে বিনয়-রাজ্যের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়, কোনও শত্রুকর্তৃক গোবিন্দপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। গোবিন্দপালের রাজ্য-নষ্টকারী সম্ভবত বিজয়সেনের পুত্র বজ্রালসেন। গোবিন্দপালের রাজ্যনাশের ১৪ এবং ৩৮ বৎসর পরেও, তাঁহার বিনয় বা গতরাজ্যের হিসাবে, সাল-গণনার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, যিনি গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থলে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তিনি ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নুতন করিয়া গড়বার অবসর পাইয়াছিলেন না। এই জগুই বিজয়-রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত হইয়াছিল না; বিজিত গোবিন্দপালের বিনয় রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল।

যে দুইটি স্বতন্ত্র রাজবংশ অভ্যুদিত হইয়া, পাল-রাজবংশ উন্মূলিত করিয়াছিল, তন্मध्ये বর্ম্মা-বংশ পূর্বতন এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য। বর্ম্মা-বংশের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনকারীর প্রধান অবলম্বন হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন, এবং হরিবর্ম্মার ও তাঁহার পুত্রের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেব-বালবলভীভূজঙ্গের ভূবনেশ্বরের প্রশস্তি। হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনের পশ্চাদ্ভাগের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি এবং তাহার

* Cunningham's Archæological Survey Report, Vol. III, p. 125.
বঙ্গবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিলালিপির একটি ছাপ তুলিয়া অনুসন্ধান-সমিতিকে প্রদান করিয়াছেন।

† Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 99.

‡ Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. Cambridge, p. iii.

একটি আনুমানিক পাঠ মাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। এই অংশ হইতে জানিতে পারা যায়—“বিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়ক্কাবার হইতে মহারাজা-ধিরাজ-জ্যোতিবর্ধ-পাদানুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজা-ধিরাজ-শ্রীহরিবর্ধদেব” ভূমিদান করিতেছেন। উট্ট-ভবদেব-বালবলভী-ভুজঙ্গের প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,—সাবর্ণমুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন, তন্মধ্যে রাঢ় বা রাঢ়দেশের অলঙ্কার সিদ্ধলগ্রাম সর্বাগ্রগণ্য। এই গ্রামের একটি সমুন্নত বংশে (প্রথম) ভবদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গোড়নূপ হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পুত্র রথাক্ষ। রথাক্ষের পুত্র অত্যাক্ষ। অত্যাক্ষের পুত্র স্কুরিত-বুধ। স্কুরিত-বুধের পুত্র আদিদেব। আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্জন। গোবর্জন জৈনক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের চুহিতার [সান্ধোকার] পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্জন এবং সান্ধোকার পুত্র ভবদেব-বালবলভীভুজঙ্গ দীর্ঘকাল হরিবর্ধদেবের মন্ত্রী ছিলেন, এবং পরে হরিবর্ধদেবের পুত্রেরও মন্ত্রিপদারূঢ় ছিলেন। এই দ্বিতীয় ভবদেব রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন; এবং ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করাইয়া, সেই মন্দিরে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

§ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস”, দ্বিতীয় ভাগ, ২১০ পৃষ্ঠা ও চিত্র দৃষ্টব্য বসু মহাশয় বলেন,—সুলতান মামুদ কতক কাগুকুজ আক্রমণ সময়ে (১০১৮ খৃষ্টাব্দে) যিনি কাগুকুজের রাজা ছিলেন, তাহার নাম জয়পাল (কুল-গ্রন্থোক্ত জয়চন্দ্র)। “অধিক সম্ভব, পরম ধার্মিক মহারাজ হরিবর্ধদেব কনোজপতি জয়পাল বা জয়চন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।” আবার “প্রায় আড়াই শত-বর্ষ পূর্বে” আবির্ভূত রাঘবেন্দ্র কবিশেখর “প্রাচীন লোকগিণের মুখে শুনিয়া এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থ সকল দেখিয়া” যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, হরিবর্ধদেব যখন “গোড়োড়্রবক্ষাপিণা”, তখন কাগুকুজে “যবনাগমন” ও “রাজ্যনাশ” দেখিয়া, গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। অতএব হরিবর্ধা সুলতান মামুদ ও জয়চন্দ্রের বা জয়পালের সমসাময়িক। সুলতান মামুদের আক্রমণ-সময়ে যিনি কাগুকুজের অধীশ্বর এবং মুসলমান লেখকগণ যাহাকে “রায় জয়পাল” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রতীহার-রাজ রাজ্যপাল, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কুলগ্রন্থ এই রাজ্যপালের কোন খবর দিতে পারে কিনা জানি না। সূত্রং এই হিসাবে হরিবর্ধার সময় নিরূপণের জন্ত বসুমহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অমূলক। হরিবর্ধার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে প্রধান সাক্ষী হরিবর্ধার তাম্রশাসনের এবং উট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তির অক্ষর। বসু মহাশয় প্রকাশিত উক্ত তাম্রশাসনের অশ্লষ্ট প্রতিকৃতির যে কয়টি অক্ষর বুঝা যায়, তাহা বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তির অনুরূপ।

॥ আদিশুর ॥

এই প্রশস্তি যে কেবল বর্ষ-রাজবংশের এবং দ্বাদশ শতাব্দীর রাঢ়-বঙ্গের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আলোক দান করে এমন নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের আরও একটি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা করে। এই গুরুতর প্রশ্ন,—আদিশুর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? আদিশুর নামক যে প্রকৃত একজন রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে কেহ কখনও সন্দেহ করেন নাই। আদিশুর কখন কোন্ স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই কথা লইয়াই বহু দিন বাদানুবাদ চলিতেছে। কিন্তু ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তি পাঠ করিলে, আদিশুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। “গৌড়রাজমালায়” আদিশুর স্থান পাইতে পারেন কি না, এ স্থলে এ কথার মীমাংসার যত্ন করা কর্তব্য। সুতরাং, প্রক্রমভঙ্গ হইলেও, এখানে সেই প্রশ্নের বিচারের পর, বর্ষ-বংশের ইতিহাস আলোচিত হইবে।

কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথাও আদিশুরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশুরের আনুমানিক আবির্ভাব-কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্তী কালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পরবর্তী কালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদানের ভাণ্ডাররূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থনিচয়ে উল্লিখিত আদিশুর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহা এযাবৎ কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশুরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুলপঞ্জিকার

দৃষ্টান্তহলে আমরা ত, ম, এবং সএর উল্লেখ করিব। ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি সম্বন্ধে কিলহর্ন লিখিয়াছেন,—“On palaeographical grounds I do not hesitate to assign this record, like the preceding one, to about A. D. 1200 (Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 205).” কিলহর্ন “preceding one” বলিয়া যে লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ত্রিকলিঙ্গপতি প্রথম অনিয়ন্তভীমের সময়ের স্বপ্নেশ্বর-দেবের প্রশস্তি। প্রথম অনিয়ন্তভীম ১১২২ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে আবেশন করিয়া, দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বপ্নেশ্বরদেবের শিলালিপির সময় সম্বন্ধে আর কোন সংশয় হইতে পারে না। ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির অক্ষর স্বপ্নেশ্বরের লিপির ঠিক অনুরূপ বলিয়া, কিলহর্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। কিলহর্ন-কথিত ঠিকঠাক ১২০০ খৃষ্টাব্দে ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির কাল না হইলেও, অক্ষরের হিসাবে, হরিবর্মার তাম্রশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি ষোল্ল শতাব্দীর পূর্বে তৈলিয়া লওয়া যায় না।

আদিশূর রাজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক না হইলেও, জনশ্রুতিমূলক, এবং জনশ্রুতির যদি ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার অধিকার থাকে, তবে আদিশূর রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইবে না কেন? জনশ্রুতিমাত্রই যে প্রামাণ্য এবং ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয়, এমন নহে। যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য, এবং যে প্রবল জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল, তাহাই ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য।

এখন আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, উহার ঐতিহাসিকতা কত দূর। রাঢ়ীয় কুলজগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিনিবন্ধ আছে—

“আসীং পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্ ।

আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্র-সমুদ্ভবান্ ॥”*

এখানে পাওয়া গেল,—আদিশূর ছিলেন (আসীং)। বারেন্দ্র কুলজগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা আদিশূরের এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—

“জাতো বল্লালসেনো গুণী-গণিতস্তস্য দৌহিত্র-বংশে ।”

“আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন [পঞ্চব্রাহ্মণের পরিচয়] এই পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার সর্গারোহণ ॥ তদন্তে কিছুকালান্তর তত দহিত্র কুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লালসেন [বল্লালসেন কর্তৃক কুলমর্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্রবিভাগ]

* রাজসাহাব রাণী হেমন্তকুমারী-সংস্কৃতকলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক বিক্রমপুর-নিবাসী পাণ্ডিত্যবর শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় লেখককে যে পাতড়া দিয়াছেন, তাহার আরম্ভে এই শ্লোকটি আছে। তাৎপরে আর ১৩টি শ্লোকে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, এবং উপসংহারে আছে—“ইতি আদিশূর-ব্যাখ্যানং সমাপ্তং ।” বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, এই শ্লোক কয়টি “কুলমর্যাদা” সূচনায় দৃষ্ট হয়। আবার পরীক্ষিত রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ মাদ্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের “মহাশুংসাবলী” গ্রন্থে কাশ্মীরজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আগমনের কোন উল্লেখ নাই। ধ্রুবানন্দ “নত্বা তাং কুলদেবতাং”, ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া আবার ক্রিয়াছেন—

“আয়িতো বহুরুপাথাঃ শিশো গোবর্দ্ধনঃ সুখীঃ ।

গাং শিশো মকরলক্ষ জাযনাথাঃ সমা ইমে ।”

মহেশের “নির্দোষ কুলপঞ্জিকায়”—

“ক্ষিতীশো তিথিমৈধা [চ] বাতরাগঃ সুখনিধিঃ ।

সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাচ্চ আগতা গৌড়-মণ্ডলে ॥”

এই পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে, আদিশূরের নাম নাই।

ইত্যবকাশে অন্ত্যস্ত দেশীয় রাজাসকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বজ্জালসেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিয়া কহিলেন সুনহে বজ্জালসেন তোমার মাতামহ কুলোত্তব আদিশুর পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গোড়মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যখনাক্রান্ত দেশে বাস করি আমরাদিগের দেশে কিঞ্চিং ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া আমাদের দেশ পবিত্র করি।”*

আদিশুর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা প্রবল। কুলজগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস-সঙ্কলন নহে, বংশাবলী-রক্ষা। বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশুরের যে সময় নির্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই জনশ্রুতির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। “গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-

* বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ “আদিশুর রাজার ব্যাখ্যা” নামে পরিচিত।

লালোর-নিবাসী শ্রীযুত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগ্রামের শ্রীযুত জানকীনাথ সার্কভৌমের, এবং রামপুর-বোয়ালিয়ার শ্রীযুত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয়-সংগৃহীত পুঠিয়া নিবাসী * মহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের পুস্তক মধ্যে পাঁচ প্রকার “আদিশুর রাজার ব্যাখ্যা” পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই খানিতে বজ্জালসেন আদিশুরের দৌহিত্র-বংশোত্তব বলিয়া কথিত। উপরে তাহা উদ্ধৃত হইল। “গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯০ পৃঃ) উদ্ধৃত একটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে—রাজা অধর্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাজিকে যজ্ঞান্তে দক্ষিণা-দানার্থ ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে, এই ধর্মপালকে যদি পালবংশীয় ধর্মপাল মনে করা যায়, তবে আদিশুরকে ধর্মপালের পিতা গোপালের তুল্যকালীন বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত “গৌড়ে ব্রাহ্মণে” ধৃত (৯০ পৃঃ) “ভাদ্রুড়ী-কুলের বংশাবলীর” নিম্নোক্ত বচনের বিরোধী—

“তত্রাদিশুরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বোদ্ধ্বান্ন নৃপপালবংশং ।

শশাস গৌড়ং” ইত্যাদি ।

“গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-ধৃত এই শ্লেষোক্ত বচন আবার শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু কত্বেক “বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা”-ধৃত, “শাকে বেদকলষঘটক-বিমিতে রাজাদিশুরঃ স চ” (“বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ৯০ পৃঃ) এই বচনের, অর্থাৎ আদিশুর ৩১৪ শককে বর্তমান ছিলেন এই মতের বিরোধী। যে যে কুলজগণের সহিত আলাপ করিয়াছি, তাঁহারা এই সকল বচনের কোনটির বিষয়ই অবগত নহেন। সুতরাং এই সকল বচন প্রবল জনশ্রুতিমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আদিশুর সম্বন্ধে যদি কোনও জনশ্রুতি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে তাহা উপরে উদ্ধৃত আদিশুর ও বজ্জালসেনের সম্বন্ধবিষয়ক জনশ্রুতি। “গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-ধৃত “ভাদ্রুড়ী-কুলের বংশাবলীর” বচন প্রকারান্তরে ইহারই পোষকতা করে; এবং “লঘুভায়তকার”ও আদিশুর কত্বেক গৌড়ের পালবংশ উল্লেখের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (“গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৩২ পৃঃ, ৪নং টীকা) ।

কার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,†—শান্তিলা-গোত্রীয় বর্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাঞ্চপগোত্রে ৩১।৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎসরগোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।” রাষ্ট্রীয় সমাজে ৩৫ হইতে উর্দ্ধতন পর্যায়ের লোক বিরল। বাৎসরগোত্র ছাড়িয়া দিলে, বর্তমান কালকে আদিশুর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪।৫৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশুর ৮৫০ বৎসর পূর্বে [১০৬০ খৃষ্টাব্দে] বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, “বেদবাণাঙ্ক-শাক্তেভু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” [৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গোড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন। এই কিম্বদন্তীর বিরোধী নহে এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বঙ্গােসনের পূর্বপুরুষের গোড়ে আগমনকালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিগতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশুরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না।

॥ ভট্ট ভবদেব ॥

ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্টভবদেবের বংশ-বৃত্তান্তের সহিত আদিশুর কীৰ্ত্তক ব্রাহ্মণানয়ন-বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব। ভবদেব সাবর্ণ-গোত্রীয়, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সিদ্ধলগ্রামবাসী, এবং তাঁহার জননী বন্দ্যঘটী-বংশীয়া ছিলেন। সুতরাং ভবদেব যে রাঢ়িশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহ্মিয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। প্রশস্তির রচয়িতা, ভবদেবের সুহৃদ বাচস্পতি, যে ইদানীন্তনকালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভবদেবের পূর্বপুরুষগণ-সম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রশস্তিতে ভবদেব-বালবলভীভুজঙ্গকে ধরিয়া, সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষপাদে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম ভবদেবের যে গোড়-নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্টগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবত প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধলগ্রামবাসী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন।

এখন যেমন সার্বর্ণগোত্রীয় রাষ্ট্রীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণমাজই আদিশুর-আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয়-সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশুর কর্তৃক সার্বর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশুর-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যত দিন না কোনও তান্ত্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পর-বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশুরের ইতিহাস-উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনামাত্র।

ভবদেব-বালবলভীভুজঙ্গের অতিরুদ্ধ-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথম ভবদেবের সময়ে, রাঢ় গোড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং গোড়-নৃপের পদানত ছিল, এবং প্রথম ভবদেব গোড়-নৃপের প্রসাদে হস্তিনীভিট্টগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবদেবের পিতামহ আদিদেবের সময়ে, রাঢ়ে-বঙ্গে “বঙ্গরাজ্যের” প্রাধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, এবং আদিদেব তাঁহার সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। ভট্ট গুরবের এবং বৈদ্যদেবের বংশবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, তৎকালে মন্ত্রিপদ বংশানুগত ছিল। আদিদেব যে বঙ্গ-রাজ্যের সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন, তিনি সম্ভবত হরিবর্ষদেবের পিতা (?) জ্যোতিবর্ষা। জ্যোতিবর্ষা হয়ত গোড়েশ্বর কুমারপালের সময়ে, দক্ষিণ বঙ্গে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে যত্ববান হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দমনার্থ প্রেরিত বৈদ্যদেব কর্তৃক নৌ-যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন। কুমারপালের মৃত্যুর পর, জ্যোতিবর্ষার অভিলাষপূরণের আর কোন বাধা ছিল না। আদিদেবের পুত্র গোবর্ধন যুদ্ধক্ষেত্রে [বীরস্থলীস্থ] বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন [বর্ধন্য বসুমতীং;] বলিয়া কথিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি কখন মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। গোবর্ধন হয়ত জ্যোতিবর্ষা বা হরিবর্ষার একজন সেনানায়ক ছিলেন, এবং পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করায়, মন্ত্রিপদে উন্নীত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না। সুতরাং আদিদেবের মৃত্যুর পর ভট্টভবদেব বালবলভী-ভুজঙ্গ হরিবর্ষার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন; এবং হরিবর্ষার মৃত্যুর পর, তাঁহার অনুশ্লিষিতনামা পুত্রের এবং উত্তরাধিকারীর সময়েও, সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রশস্তিকার বাচস্পতি ১৮টি শ্লোকে ভবদেব বালবলভী-ভুজঙ্গের গুণগ্রামের এবং কৌন্তিকলাপের বর্ণন করিয়াছেন; তিনি কি কি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু ভবদেবের বাহুবলে এবং

নীতিকৌশলে তাঁহার প্রভুর রাজ্য কতটা উন্নতি এবং বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এই সুদীর্ঘ প্রশস্তিমধ্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে অনুমান হয়, সেনবংশের অভ্যুদয়ের পর, ভবদেব স্বীয় প্রভুকে সেনবংশীয় গোঁড়াধিপের অধীনতা স্বীকারে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং অগস্ত্যবৎ বৌদ্ধান্তোনিধি-গণ্ডুষ্করণে, পাষণ্ড-তাকিক-দলনে, এবং স্মৃতি, জ্যোতিষ, এবং মীমাংসা-শাস্ত্রের চর্চায়, মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

॥ বিজয়সেন ॥

বর্ষবংশের অভ্যুদয় এবং মদনপালের দুর্কলতা নিবন্ধন গোঁড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্তসেনের পৌত্র [হেমন্তসেন ও রাজ্ঞী যশোদেবীর পুত্র] বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্তসেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গোঁড়রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গ, বর্ষ-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবত স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্ম, বরেন্দ্র-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্তসেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয়সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য-স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন। বল্লালসেন “দানসাগরের” ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—

“তদনু বিজয়সেনঃ প্রাচুরাসীং বরেন্দ্রে”

“(হেমন্তসেনের) পর বিজয়সেন বরেন্দ্রে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন।”

বিজয়সেনের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কিল্‌হর্নের অনুসরণ করিয়া সামন্তসেনকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে, হেমন্তসেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, এবং বিজয়সেনকে দ্বিতীয় পাদে [আনুমানিক ১১২৫—১১৫০ খৃষ্টাব্দে] স্থাপিত করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আর কোন লেখক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না, এবং কিল্‌হর্নও তাঁহার মতের অনুকূল যুক্তিগুলি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রধানতঃ দুইটি প্রমাণ-বলে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদ বিজয়সেনের অভ্যুদয়কাল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে (২১ নম্ব) উক্ত হইয়াছে, তিনি “নাথ” নামক নৃপতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা জয়প্রতাপমল্লের কাটামুণ্ডুতে প্রাপ্ত ১৬৪৯

খৃষ্টাব্দের [৭৬৯ নেপালী-সম্বতের] শিলালিপিতে উল্লিখিত মিথিলার এবং নেপালের “কর্ণাটক”-বংশীয় রাজগণের বংশ-তালিকায় এক “নাগদেব” উক্ত বংশের আদিপুরুষরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।* জর্মণির প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন-সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে নাগদেব [১০১৯ শকে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে] বর্তমান ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।† প্রত্নবিদগণ দেবপাড়া প্রশস্তির “নাগ” এবং কর্ণাটক-বংশের আদিপুরুষ “নাগদেব”কে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন।‡ এই মত গ্রহণ করিলেও, একাদশ শতাব্দের শেষ পাদে বিজয়সেনের রাজত্বকাল নিরূপণ অনাবশ্যক; পরন্তু নাগদেব দ্বাদশ শতাব্দের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন; এবং সেই সময়ে, বিজয়সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কর্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশ-তালিকা-অনুসারে নেপাল-বিজয়ী হরিসিংহ নাগদেব হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের সংগৃহীত “বিবাদ-রত্নাকরের” মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, হরিসিংহ ১২৩৯ শককে [১৩১৭ খৃষ্টাব্দে] জীবিত ছিলেন। সুতরাং, প্রতি পুরুষ গড়ে ২৩ বৎসর হিসাবে, হরিসিংহের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ নাগদেব, মোটামুটি ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গোড়রাজ্যের সেই অধঃপতনের সময়, কর্ণাটক-বিজয়-বংশোদ্ভব বিজয়সেন বরেন্দ্রে যে কার্য-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অপর একজন কর্ণাট-ক্ষত্রিয়, নাগদেব, পূর্বাধিই মিথিলায় সেই কার্যেই ব্রতী হইয়াছিলেন। সুতরাং নূতন ব্রতী বিজয়সেনের সহিত পুরাতন ব্রতী নাগদেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় প্রমাণ লক্ষণ-সম্বৎ। কিল্‌হর্ন স্থির করিয়াছেন,—১১১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে এই সম্বতের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; এবং তিনি দেবপাড়া-প্রশস্তির ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লক্ষণসেনের রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই সম্বৎ-গণনার আরম্ভ হয়। আবুল ফজলের “আকবর-নামা”-রচনার সময়েও, লক্ষণ-সম্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। § সুতরাং লক্ষণসেনের পিতামহ বিজয়সেন অবশ্য

* Kielhorn's List of Northern Inscriptions, Appendix to Epigraphia Indica, Vol. V.

† Deutsche Morganlandische Gessellschaft.

‡ Epigraphia Indica, Vol. I.

§ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1888, Part I, p. 2.

একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লালসেন-রচিত দানসাগর-নামক নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—

“নিখিল-চক্রতিলক-শ্রীমদ্বল্লাসেনেন পূর্ণে

শশি-নব-দশমিতে শক-বর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।”

অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ (১১৬৯ খৃষ্টাব্দ) পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন “দানসাগর” রচনা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোম্বাই-প্রদেশে সংগৃহীত বল্লালসেন-রচিত “অভূত সাগরের” যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,— বল্লালসেন “শাকে খ-নব-খেন্দকে” [১০৯০ শকাব্দে = ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে] “অভূত সাগর” আরম্ভ করিয়াছিলেন।* বোধ হয় এই নিমিত্ত কিল্বর্ন পূর্ব মত পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বল্লালসেনের রাজত্ব তৃতীয় পাদে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। † শ্রীযুত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অভূত সাগর হইতে বল্লালসেনের রাজ্যাভিষেকের কালও আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ‡ অভূতসাগরের, “সপ্তর্ষীনামস্তুতানি”-প্রকরণে লিখিত আছে,—“ভূজ-বসু-দশ মিতে (১০৮১) শকে শ্রীমদ্বল্লাসেন-রাজ্যাদৌ” ইত্যাদি। ইহাতে ১০৮১ শক (১১৫৯ খৃষ্টাব্দ) বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

‖ দানসাগরের রচনাকাল ‖

শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “দানসাগরের” এবং “অভূত সাগরের” রচনা কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক প্রামাণ্য রূপে গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ মনে করিবার প্রথম কারণ,—“দানসাগরের” এবং “অভূতসাগরের” যে সকল পুঁথিতে কাল-বিজ্ঞাপক

‖ J. A. S. B., 1896, Part I, p. 23. India Office-এর পুস্তকালয়ে যে এক খণ্ড “দানসাগর” আছে, তাহার উপসংহারেও, এই শ্লোক আছে। (Eggeling's Catalogue, p. 545)। রাজসাহী কলেজের সংস্কৃত-ধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বলেন,—তিনি সিভিলিয়ান Mr. Ranking-এর নিকট একখণ্ড “দানসাগর” দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই শ্লোক আছে।

* Bhandarkar's Report on the search for Sanskrit Manuscripts during 1887—88 and 1890-91, p. lxxxv.

† Epigraphia Indica, Vol. viii, Synchronous Table for Northern India, A. D. 400—1400, column 7.

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1906, p. 17 note.

শ্লোক আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এবং উহা ছাড়া, এই গ্রন্থের আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল শ্লোক নাই। সুতরাং, উভয় গ্রন্থের কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক পরবর্তী কালে প্রস্কিপ্ত হওয়া সম্ভব।

আর এক হিসাবে দেখিতে গেলে, ঐক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। “দানসাগর” স্মৃতি-নিবন্ধ, এবং “অমৃত সাগর” জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাঁহারা স্মৃতি বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনকারীগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে, চিরকালই উদাসীন। সুতরাং, কোন কোন লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল-বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। সেই জন্ম সকল পুস্তকে এই বচন দৃষ্ট হয় না।

এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকালয়ে যে “অমৃত সাগরের” পুঁথি আছে, তাহার মঙ্গলাচরণের সঙ্গিত ভাণ্ডারকার-বর্ণিত পুঁথির মঙ্গলাচরণের তুলনা করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসম্মত বিবেচিত হয়। বোম্বাইএর পুঁথির মঙ্গলাচরণের প্রথম নয়টি শ্লোকে, সেনরাজ-বংশ, গ্রন্থকার বজ্জালসেন, এবং তাঁহার সহযোগী জীনিবাস প্রশংসিত হইয়াছেন। এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুঁথিতে, এই নয়টি শ্লোকের পাঁচটি মাত্র দৃষ্ট হয়; ২, ৩, ৪ এবং ৬ নং শ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোম্বাইএর পুস্তকে এই নয়টি শ্লোকের পরে, সাতটি শ্লোকে, যে যে মূল গ্রন্থে তাহাতে “অমৃত সাগরের” বচন-প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎপরে আর দ্বাদশটি শ্লোকে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ তালিকা এবং বিষয়-সূচী অনেক নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুঁথির ভূমিকায় এই ১১টি শ্লোকের একটিও স্থানলাভ করে নাই। এই সকল শ্লোকেও কি তবে প্রস্কিপ্ত? বিষয়-সূচীর পর, বোম্বাইএর পুঁথিতে নিয়োক্ত শ্লোক তিনটি আছে—

“শাকে খ-নব-খেংহকে আরেভেভুতসাগরং ।

গৌড়েন্দ্র-কুংজরালান-স্তংভবার্হহীপতিঃ ॥ ১ ॥

গ্রংস্থেশ্বিনসমাপ্ত এব তনয়ং আত্মাজ্জারক্ষা-মহা-
দীক্ষাপর্বণি দীক্ষণাম্নিজকৃতেনিষ্পত্তিমভার্থা সঃ ।

নানাদান-চিতাংবু-সংচলনতঃ সূর্যাস্বজা-সংগমং

গঙ্কায়ং বিরচয়া নির্জরপুরং ভার্যানুযাতো গতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমল্লক্ষণসেন-ভূপতিরতিস্নাত্যো যদুদ্যোগতো
নিষ্পন্নোত্তসাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লাল-ভূমীভুজঃ।
খাতঃ কেবলমগ্নবুঃ (?) সগরজ-স্তোময় তৎ পুরণ-
প্রাবাগোন ভগীরথ স্ত ভুবনেষদ্যপি বিদ্যোততে ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—রাজা বল্লালসেন ১০৯০ শাকে “অদ্বুতসাগরের” আরম্ভ করিয়াছিলেন (১)। তিনি এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, এবং তনয়ের উপর সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন (২)। লক্ষণসেনের উদ্যোগে “অদ্বুতসাগর” সমাপ্ত হইয়াছিল (৩)।

এই তিনটি শ্লোক একসূত্রে গ্রথিত। ইহার একটি ফেলিয়া, আর একটি রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিতে তাহাই করা হইয়াছে। প্রথম দুটি পরিত্যক্ত এবং তৃতীয়টি মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায়, ‘শাকে খ-নব খেংছকে’ ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না। রাখালবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি,—বোধগম্যার দুইখানি শিলালিপির উপসংহারে আছে—

“শ্রীমল্লক্ষণসেনসম্যাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯”

“শ্রীমল্লক্ষণসেন-দেবপাদানা-মতীতবাজ্যে সং ৭৬ বৈশাখা-বদি ১২ গুরৌ ॥”

“শ্রীমল্লক্ষণসেনসম্যাতীতরাজ্যে সং ৫১”—ইহার অর্থ লক্ষণসেনের রাজ্যে লুপ্ত হওয়ার পর হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথবা লক্ষণসেনের রাজ্যলাভ হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথচ লক্ষণসেনের রাজ্য লোপের পরে। কিল্‌হর্গ এক সময় শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, সং ৫১ = ১১২০ + ৫১ = ১১৭১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছিলেন। রাখালবাবু এই অর্থ ই ব্যয় রাখিতে যত্ন করিয়াছেন। এখানে শকার্খ লইয়া কাটাং কুটাং না করিয়া, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দুইখানি বোধগম্যার লিপির অক্ষরের, [বিশেষতঃ প এবং দ-এর] সহিত গয়ার ১২৩২ সম্বতেব (১১৭৫ খৃষ্টাব্দের) গোবিন্দপালদেবের গত্তরাজ্যের চতুর্দশ সম্বৎসরের শিলা-লিপির,† অথবা বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের প এবং দ অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,— ১২৩২ সম্বতেব গয়ার লিপির এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের প এবং দ

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ (১৩১৮), ২১৪ এবং ২১৬ পৃঃ।

† Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. III, plate রাখালবাবু অনুসন্ধান-সমিতিকে এই শিলা-লিপির একখানি প্রতিলিপি এমান উপকৃত করিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

পুরাতন নাগরীর ঢঙ্কর ; পক্ষান্তরে, আলোচ্য বোধগয়ার লিপিব্ধয়ের প এবং দ বর্ধমান বাঙ্গলা প এবং দ এর মত । ঠিক এই প্রকারের প এবং দ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাব্দের [১২৪৩ খৃষ্টাব্দের] তাম্রশাসনে § দেখিতে পাওয়া যায় । দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে গৌড়-মণ্ডলে পুরাতন নাগরী ঢঙ্কর প এবং দ-ই যে প্রচলিত ছিল, বল্লাভদেবের “শকে নগ-নডো-রুদ্রৈঃ সংখ্যাতে” অর্থাৎ ১১০৭ শকের (১১৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের) আসামের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে । সুতরাং “শ্রীমল্লক্ষণসেনস্বাতীতরাজ্যে সং ৫১” ১১৭১ খৃষ্টাব্দরূপে গ্রহণ না করিয়া, আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষণসেনের মৃত্যু ধরিয়া,] ১২৫১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । এই সিদ্ধান্তের এক আপত্তি আছে । লক্ষণসেনের “অতীতরাজ্য” হইতে কোন সন্থৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই । উত্তরে বলা যাইতে পারে—গোবিন্দপালদেবের “গতরাজ্য” বা “বিনক্ষরাজ্য” হইতেও কোন সন্থৎ প্রচলিত নাই । পক্ষান্তরে গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সন্থৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই । “গতরাজ্যে” “অতীতরাজ্যে” বা “বিনক্ষরাজ্যে” প্রভৃতি বিশেষণ-পদের এইরূপ অর্থ প্রতিভাত হয়—গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলোপের পরে, মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল ; লক্ষণ-সেনের রাজ্যলোপের পরেও মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল । তখন মগধে কেহ “প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্য” প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না ; অথবা যিনি মগধ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, মগধবাসিগণ তাঁহাকে তখনও অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না । এই নিমিত্ত “গতরাজ্যের” বা “অতীত রাজ্যের” সন্থৎ-গণনা প্রচলিত হইয়া থাকিবে । এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—লক্ষণ-সন্থতের সূচনা এবং প্রচলন হইল কবে হইতে ? পুত্র বিশ্বরূপসেনের সময়ে লক্ষণ-সন্থৎ প্রচলিত ছিল না । বিশ্বরূপসেনের (কেশবসেনের ?) ইদিলপুরের তাম্রশাসনের সম্পাদন-কাল “সং ৩ জ্যৈষ্ঠ দিনে—” এবং মদনপাড়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের সম্পাদন-কাল, সং ১৪ আশ্বিনদিনে ১ ।” পাল এবং সেন-রাজগণের সময়ে গৌড়-মণ্ডলে শকাব্দ বা বিক্রম-সন্থৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল না, নৃপতিগণের বিজয়-রাজ্যের সন্থৎসরই প্রচলিত ছিল । পাল এবং সেন-বংশের রাজ্য-নক্ষের পর, কিছুদিন “বিনক্ষরাজ্যের” বা “অতীতরাজ্যের” সন্থৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল । তাহার পরে, প্রচলিত অঙ্কের অভাব পূরণের জন্ত, “লক্ষণাব্দ” উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে ।

§ J. A. S. B., 1874, Part I, plate XVIII.

† Epigraphia Indica, Vol. V, plates 19-20.

॥ বিজয়সেন ॥

লক্ষণাকের মূল যাহাই হউক, আমরা কুমারদেবীর সারনাথ-লিপিতে, রামপালচরিতে, বৈদ্যদেবের এবং মদনপালের তান্ত্রশাসনে, বরেন্দ্রদেশের যে ইতিহাস প্রাপ্ত হই, তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পূর্বে বিজয়সেন কর্তৃক বরেন্দ্রে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব বোধ হয়। বিজয়সেন যখন বরেন্দ্রে স্বাধীনতা অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রথমেই অবশ্য তাঁহার সহিত গোড়পতি পাল-নরপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবপাড়ার প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,—বিজয়সেন “গৌড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ” করিয়াছিলেন (২০ শ্লোক)। সম্ভবত এই আক্রমণের ফলেই “গৌড়েন্দ্র” বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া, মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপর প্রতিবেশী নৃপতিমাঈই হয়ত তাঁহার প্রতিকূলতাচরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। কার্য্যত না হউক, নামতঃ কামরূপ-রাজ এবং কলিঙ্গ-রাজ, গৌড়েশ্বরের অনুগত ছিলেন। গৌড়েন্দ্রকে বরেন্দ্র হইতে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া, হয়ত তাঁহার বিদ্রোহী বিজয়সেনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিকার উমাপতিধর লিখিয়াছেন—বিজয়সেন “কামরূপভূপকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ [রাজকে] পরাজিত করিয়া-ছিলেন (২০)।” মিথিলাপতি নাগদেব বিজয়সেনকে আক্রমণ করিতে আসিয়া, ধৃত এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। উমাপতিধর লিখিয়াছেন,—বিজয়সেন নাগ বাতীত রাঘব, বর্দ্ধন, এবং বীর নামক আরও তিনজন নৃপতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন (২১ শ্লোক)। গৌড়রাজ্যের পশ্চিমাংশ [“পাশ্চাত্য-চক্র”] জয় করিবার জন্ত, তিনি যে “মৌবিতান” প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না (২২ শ্লোক)। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গ এবং রাঢ়ে, বর্ম্মরাজ কর্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরেন্দ্রে বিজয়সেনের আধিপত্য বন্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেখানে তিনি অনেক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের অবসর পাইয়াছিলেন। উমাপতিধর লিখিয়া গিয়াছেন,—বিজয়সেন অনেক “উত্তম দেবমন্দির” এবং “বিস্তীর্ণ (বিতত) তল্ল” প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন-প্রতিষ্ঠিত প্রহ্লাদেশ্বর-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং তাঁহার রাজধানী— [জনশ্রুতির “বিজয়রাজার বাড়ী”]—বিজয়নগর বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে অবস্থিত। উমাপতিধর-বিরচিত বিজয়সেনের প্রশস্তি-সম্বলিত শিলা-ফলক বরেন্দ্রে ব অন্তর্গত দেবপাড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

॥ বল্লালসেন ॥

বিজয়সেনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী [বল্লালসেন] পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সমগ্র গৌড়রাজ্য করায়ত্ত করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন। বিজয়সেন পালবংশজ “গৌড়েশ্বর”কে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন, স্বীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য, পাল-রাজবংশ উন্মূলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপালদেব সম্ভবত বল্লালসেন কর্তৃকই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ধরাজকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া, বল্লালসেন বঙ্গে এবং রাঢ়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। রাজত্বের “১১ বৈশাখদিনে ১৬” সম্পাদিত, [কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত] তান্ত্রশাসনে তাঁহার বঙ্গ এবং রাঢ় অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তান্ত্রশাসনে “শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারে” সম্পাদিত হইয়াছিল. এবং এতদ্বারা “শ্রীবর্দ্ধমান-ভুক্তান্তঃপাতী উত্তররাঢ়া-মণ্ডলের” ভূমি দান করা হইয়াছিল। বল্লালসেন সম্ভবত কলিঙ্গ-রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগরে প্রাপ্ত তান্ত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে—লক্ষ্মণসেন “কলিঙ্গ-রমণীগণের সহিত কোমার-কেলি করিয়াছিলেন।” ইহার অর্থ এই,—লক্ষ্মণসেন যখন যুবরাজ, তখন পিতার সহিত অথবা পিতার আদেশানুসারে, কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যলাভ ধরিলে, “সং ১১” [কাটোয়ার তান্ত্রশাসনের সম্পাদনকাল] ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই বৎসর বল্লালসেন “দানসাগর” সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, এবং ইহার পূর্ব বৎসর, “মল্লতসাগরের” সঙ্কলন আরম্ভ করিয়া, তাহা সমাপ্ত না হইতেই, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয়,—“দানসাগর” সঙ্কলিত হওয়ার [১১৬৯ খৃষ্টাব্দের] পরে, বল্লালসেন বড় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। “দানসাগরের” মঞ্জলাচরণে তিনি আপনাকে “গৌড়েশ্বর” বলিয়াছেন। পরবর্তী-কালের গৌড়রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়,—বল্লালসেন গৌড়রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিহীন করিতে সমর্থ হইলেও, দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষস্বায়ী রাজত্বকালে,—বিস্তীর্ণ গৌড়-মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার—গৌড়রাজ্য পুনরায় সুগঠিত এবং এককেন্দ্রীভূত করিবার—অবসর পাইয়াছিলেন না।

॥ লক্ষ্মণসেন ॥

বল্লালসেন যে গৌড়রাজ্য-পুনর্গঠনপ্রত্ন অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন তাহা সমাপ্ত করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের এই অক্ষয়তাই গোড়ের সর্বনাশের কারণ। লক্ষ্মণসেন পিতৃপিতামহের আরক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নের ক্রটি করেন নাই; কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র কিছুই সে মহদনুষ্ঠানের উপযোগী ছিল না। লক্ষ্মণসেনের, ধর্ম্মপাল-মহীপাল-রামপালের তুল্য প্রতিভা ছিল না। প্রজাপুঞ্জের নির্বাচিত [বহুকাল গোড়সিংহাসনের অধিকারী] গোপালের বংশধরগণকে গোড়জন যেরূপ ভক্তি-নেত্রে দেখিতেন, বিদেশাগত পালরাজকুল-উন্মূলনকারী বিজয়সেনের এবং বল্লালসেনের উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণসেন সেরূপ ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। সেকাল আর একালে প্রভেদও অনেক ছিল। বয়েন্ডের বিদ্রোহে গোড়ের প্রজাশক্তি এবং রাজশক্তি এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, কর্ণাটাগত সেনবংশের অভ্যুদয়ে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবং “মাংস-শ্যাম” নিবারণের, অথবা “অনীতিকারন্দের” প্রতীকারের অধিকার বিস্মৃত হইয়া গোড়জন কালক্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অভ্যুদয়ে গোড়ের সর্বনাশের মূল বা সর্বনাশের ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে না; বিজয়সেনের অভ্যুদয়েই গোড়ের সর্বনাশের প্রকৃত মূল বা ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে।

গোড়াধিপ লক্ষ্মণসেনও অবশ্যই কলিঙ্গ-পতি এবং কামরূপ-পতিতে বশীভূত রাখিতে যত্ন করিয়াছিলেন; এবং ১১৪২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের আক্রমণ-মূলে কাশ্যকুঞ্জেশ্বরের মগধের উপর যে দাবী জন্মিয়াছিল, তাহার নিকাল করিবার জগ্ন, কাশ্যকুঞ্জেশ্বরের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেন “বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপঃ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের সময়, গোড়-সেনা যে কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল, তৎসম্পর্কে অপর পক্ষও সাক্ষ্যদান করিতেছে। আসামে প্রাপ্ত কুমার বল্লভদেবের ১১০৭ শক-সম্বৎসর [১১৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের] তাম্রশাসন* হইতে জানা যায়, বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব-ত্রৈলোক্যসিংহের সময়, গোড়সেনা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল। এই শাসনে উক্ত হইয়াছে—

* Epigraphia Indica, Vol. V. pp. 184.

“যেনাপান্ত-সমস্ত-শত্রু-সময়ঃ সংগ্রামভূমৌ রিপু
শক্রো বঙ্গ-করীন্দ্র-সঙ্গ-বিষমে সাটোপ-যুদ্ধোৎসবে।
যেনাত্যর্থময়ং স্বয়ং সফলিত জৈলোক্যাসিংহো বিধিঃ
সোভুস্তান্দ্র-বংশ-রাজতিলকো রায়ারিদেবো নৃপঃ ॥”

উপস্থিতি-নিবন্ধন-ভয়াবহ সমরোৎসবে শত্রুগণকে অস্ত্র চালনা পরিভ্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন (৫ শ্লোক)।” রায়ারিদেব গোড়-সেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, এ কথা এখানে স্পষ্ট বলা হয় নাই। সুতরাং মাধাইনগর-তাম্রশাসনে উক্ত-“বিক্রম-বশীকৃতকামরূপঃ”—নিরর্থক না হইতেও পারে।

লক্ষ্মণসেনের এবং বিশ্বরূপসেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণসেন কর্তৃক কাশি-রাজের (কাশ্যকুঞ্জ-রাজের) এবং কলিঙ্গ-রাজেরও পরাজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মাধাইনগরের তাম্রশাসনে ক্ষোদিত রহিয়াছে,—“তিনি সমরক্ষেত্রে কাশি-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।” বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—দক্ষিণসাগরের তীরে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে—অসি, বরণা, এবং গঙ্গাসঙ্গমে বিশ্বেশ্বরের কাশীধামে—ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রয়াগধামে—লক্ষ্মণসেন উচ্চ যজ্ঞ-যূপের সহিত সমর-জয়স্তুম্ভ-মালা স্থাপিত করিয়াছিলেন (১২ শ্লোক)। লক্ষ্মণসেন যখন গৌড়াধিপ, তখন কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসনে গাহড়বাল-রাজ জয়চ্ছন্দ্র, এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজরাজ, এবং তৎপরে দ্বিতীয় অনঙ্গভীম, সমাসীন ছিলেন। ইঁহারা কেহই গৌড়াধিপের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং ইঁহাদিগের সতিত যুদ্ধে গৌড়াধিপের জয়লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন গোড়-রাজ্যের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভাস্তরীণ ঐক্যসাধনে, এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্মই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

॥ হিন্দুস্থানে তুরুক ॥

তুরুকগণের গোড়বিজয়-রহস্য বৃষ্টিতে হইলে, তুরুক-চরিত্র এবং তাহাদিগের উত্তরাপথের অপরাপের অংশের বিজয়-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। আরবগণ উত্তরাপথের সিংহদ্বারোদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন না। ইঁহারা সেই তুরুক কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা [সবুদ্ধিগিন, মামুদ, এবং তাঁহাদের অনুচরগণ] তুরুক-জাতীয়। মধ্যএসিয়ার মরুময় মালভূমি তুরুকগণের আদি-নিবাস; নিয়ত পালিত পশুপাল লইয়া, গোচারণক্ষেত্রের অনুসন্ধান করাই ইঁহাদিগের বৃত্তি ছিল। আদিবাস-ভূমির জলবায়ু এবং চিরঅভ্যাস মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণকে কঠোরকর্ম, চঞ্চল এবং অগ্রগমনশীল করিয়া তুলিয়াছিল। চিরচাঞ্চল্য এবং অগ্রগমনশীলতা মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণের জাতীয় চরিত্রের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এই

জাতীয় চরিত্রের বলে বলীয়ান ইউটিগণ, আদি-নিবাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া, [খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দে] কুষাণসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; হুণগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে পূর্ব-ইউরোপ এবং দক্ষিণ-এসিয়া ধ্বংসবিক্ষণ্ত করিয়াছিলেন : খৃষ্টীয় নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত তুরুকগণ এবং [তাহাদের জাতি] মোগলগণ, অবিরলধারে দলে দলে আসিয়া, ক্রমে আরব-সাম্রাজ্য, রোম-সাম্রাজ্য, চীন-সাম্রাজ্য এবং আরও অনেক প্রাচীন রাজ্য এবং প্রাচীন সভ্যতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কি এসিয়ায়, কি ইউরোপে, সুসভ্য স্থির-নিবাস কৃষিজীবী জনগণ কখনও মরুভূমির কঠোরকর্ম্মী চঞ্চল সম্ভানগণের আক্রমণবেগের গতিরোধ করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সূচনা হইতে, যাহাদিগের আক্রমণ-প্রবাহ উত্তরাপথে প্রধাবিত হইয়া, ক্রমে হিন্দু-স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং হিন্দু-সভ্যতা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা তুরুক-জাতীয়। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, জাতীয় চরিত্রের প্রেরণাই তাহাদিগকে ভারত-আক্রমণে ব্রতী করিয়াছিল ; এবং আদি-নিবাসভূমির কঠোর শিক্ষা তাহাদিগকে শস্য-শ্যামলা ভারতমাতার আদরে লালিত পালিত সম্ভানগণের পক্ষে দুর্জয় করিয়া তুলিয়াছিল। উত্তরাপথের একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর রাজনীতিক অবস্থা—ঐক্যবিধানকর্ম্ম সার্ক্যভোম-নৃপতির অভাব, এবং অন্তর্দ্রোহ, আক্রমণকারিগণের পথের প্রকৃত বাধা অন্তর্হিত করিয়া রাখিয়াছিল।

গজনীর সুলতান মামুদের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই, সেলজুকিয়া-তুরুকগণ, মধ্য-এসিয়া হইতে বিনির্গত হইয়া, মামুদের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ কাড়িয়া লইয়া, গজনী-রাজ্যের তুরুকগণকে হীনবল এবং তুরুক-প্রবাহের প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা পাঞ্জাবের পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সুলতান মামুদের সময়, আহম্মদ নিয়াল্‌তগীন্ কর্তৃক বারাণসী-আক্রমণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মামুদের উত্তরাধিকারী সুলতান ইব্রাহিম (১০৪৮—১০৯৯ খৃষ্টাব্দ) সেলজুক-সম্রাট-মালিক শাহের তনয়্যার সহিত স্বীয় তনয়ের বিবাহ দিয়া, রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ হিন্দুস্থানে আক্রমণ করিয়া, অনেকগুলি স্থান এবং দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন।* আলাউদ্দিন মামুদের সময় (১০৯৯—১১১৬ খৃষ্টাব্দ), “তুঘাতিগিন্ হিন্দুস্থানে [বিধর্ম্মগণের সহিত] ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্ম, গঙ্গা পার হইয়াছিলেন ; এবং এমন একস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, যেখানে সুলতান মামুদ ভিন্ন, আর কেহ কখনও সসৈন্তে

* Raverty's "Tabakat-i-Nasiri", p. 105, note 4.

উপনীত হইতে পারেন নাই।” † সুলতান বহরাম শাহ (১১১৮—১১৫৮ খৃষ্টাব্দ), সেল্জুক-সুলতান সঞ্জয়ের প্রসাদে গজনীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে ঘোরের অধিপতি আলাউদ্দীন একবার গজনীনগর ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনিও হিন্দুস্থানে ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ‡

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে, একাদশ শতাব্দীতে, পাঞ্জাব এবং গোড়-রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূভাগের শাসন-ভার য়াহাদিগের হস্তে লুপ্ত ছিল, তাঁহাদিগের গজনী-রাজ্যবাসী তুরুকগণের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিবার শক্তি ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে এক দিকে গজনীরাজ্য যেমন নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, অপর দিকে শাকস্বরীর (আজমীরের) চৌহান-রাজগণ এবং কাশ্মীরের গাহড়বাল-রাজগণ তেমনি পবাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় যদি চৌহান এবং গাহড়বাল মিলিত হইতে পারিতেন, তবে বোধ হয় অনায়াসে উত্তরাপথের সিংহাসন শত্রুশূন্য করিতে পারিতেন। কিন্তু, একশত বৎসরের মধ্যে কখনও ইঁহার সন্মিলিত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না; অবশেষে মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী আসিয়া, একে একে উভয় রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। দুর্বল গজনবী-তুরুকগণও গাহড়বাল এবং চৌহান-রাজগণকে বিশ্রাম দিয়াছিলেন না: বহরাম শাহ সম্ভবত বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কুমারদেবীর সারনাথের শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে—গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্র (+ ১১১৫—১১৫৪+ খৃষ্টাব্দ) মহাদেব কর্তৃক “দুই তুরুক-সৈন্যের হস্ত হইতে বারাণসী রক্ষা করিবার জন্ত” [বারাণসীং..... দুই-তুরুক-মুড়াটাদবিতুং] নিযুক্ত হইয়াছিলেন। § তুরুক-সৈন্যের হস্ত হইতে গোবিন্দচন্দ্র যে বারাণসীর উদ্ধার-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বারাণসী রক্ষা করিয়াই, তাঁহার তপ্ত হওয়া উচিত ছিল কি ?

চৌহান-রাজ বাসলদেব, এবং গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র গাহড়বাল-রাজ বিক্রমচন্দ্রকেও, গজনবী-তুরুকগণের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল; ১২২০ সন্থতের [১২-ন খৃষ্টাব্দের] দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভ-লিপিতে হইয়াছে—
চৌহান-রাজ বাসলদেব

† Ibid, p. 107.

‡ Ibid, p. 110.

§ Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 324.

“আর্য্যাবর্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ শ্লেচ্ছ-চিচ্ছেদনাভিঃ।”

“শ্লেচ্ছ নাশ করিয়া, আর্য্যাবর্তের নাম পুনরায় যথার্থ করিয়াছিলেন।” প্রশস্তিকার হয়ত এখানে চৌহানরাজ্য-অর্থে “আর্য্যাবর্ত” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ, বীসলদেব বা অশ্ব কোন হিন্দু-নরপতি কখনও পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন, গজনবী সুলতানগণের ইতিহাসে এরূপ আভাস পাওয়া যায় না। ১২২৪ সন্থতের [১১৬৮ খৃষ্টাব্দের] গাহড়বাল-রাজ বিজয়চন্দ্রের [কমৌলীতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে তিনি

“ভুবন-দলন-হেলাহর্ম্য হম্মীর-নারী-
নয়নজলদ-ধারা-ধৌত-ভুলোক-তাপঃ”।

“হেলায় ভুবনদলন হম্মীরের নারীগণের নয়ন-জলধারা দ্বারা ভুলোকের তাপ-ধৌতকারী” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। “হম্মীর” এ স্থলে আমীর বা গজনবী-সুলতান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চৌহান বীসলদেব এবং গাহড়বাল বিজয়চন্দ্রের সময়ের গজনবী-সুলতান খুসরু শাহ, গজনবী হইতে তাদ্ধিত হইয়া আসিয়া, লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ দূরদৃষ্ট পতিত হইয়াও, তিনি তুরুক্ষের স্বভাবগত অগ্রগমনশীলতা ভাগ করিতে পারিয়াছিলেন না; সম্ভবত চৌহান এবং গাহড়বাল, এই উভয় বাজাই, একবার একবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরুক্ষ-যোদ্ধগণ এযাবৎ গাহড়বাল-বাজা জয় করিতে অসমর্থ হইলেও, তুরুক্ষ-ঔপনিবেশিকগণ রাজার নানা স্থানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গাহড়বাল-রাজ চন্দ্রদেবের, মদনচন্দ্রের, গোবিন্দচন্দ্রের এবং বিজয়চন্দ্রের অনেক তাম্রশাসনে “তুরুক্ষ-দণ্ড” নামক বাজকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “তুরুক্ষ-দণ্ড” নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়,— তুরুক্ষ-প্রজাগণকে এই বিশেষ কর প্রদান করিতে হইত।

১১৬৮ কি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে, শেষ গজনবী-সুলতান খুসরু-মালিক, লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ১১৭০ খৃষ্টাব্দে গাহড়বাল জয়চন্দ্র কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ১১৭০ হইতে ১১৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে, চৌহান দ্বিতীয় পৃথ্বিরাজ আজমীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; এবং ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বোরী গজনীনগর

* Indian Antiquary, Vol. XIX, p. 215. মনুসংহিতার (২২০ শ্লোকের) ভাষ্যে মেধাতীর্থ আর্য্যাবর্তের এই রূপ অর্থ লিখিয়াছেন—“আর্য্যাবর্তম্ যত্র পুনঃ পুনরুত্তবন্ধাক্ষা-কক্ষ্যাপি ন চিরং যত্র শ্লেচ্ছাঃ স্মাতারী ভবন্তি।” প্রশস্তিকার এইরূপ অর্থে ই এখানে আর্য্যাবর্ত-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

অধিকার করিয়া, অনুজ মহীজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীকে সুলতান মামুদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহম্মদ-ঘোরী পরাজয়েও পরাঙ্মুখ না হইয়া, কেমন করিয়া একে একে এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনাশ করিয়া হিন্দুস্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন এখানে নিম্প্রয়োজন। লাহোরের সুলতান, দিল্লী ও আজমীরের চৌহানরাজ এবং কনোজের গাংড়বালরাজ [সমবেতভাবে না হউক] স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণকারীর গতিরোধার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের দমনার্থ মহম্মদ ঘোরীকে পুনঃ পুনঃ গজনী ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল এবং মহীপালের গৌড়রাজ্য [একরূপ নির্ব্বিবাদে] মহম্মদ ঘোরীর একজন দাসানুদাসকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল।

॥ মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ॥

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার নামক খল্জ্ বা খিলজি বংশীয় একজন তুর্কজ, মুহীজুদ্দীন মহম্মদের সেনাপ্রণীতে কর্ণের অনুসন্ধানে, গজনী গমন করিয়া-ছিলেন। মহম্মদের চেহারা পছন্দসহি না হওয়ায়, সেনাসংগ্রহ-বিভাগের প্রধান কর্ণচারী তাঁহাকে একটি অল্প বেতনের কর্ম দিতে চাহিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার প্রস্তাবিত কর্ম গ্রহণ না করিয়া হিন্দুস্থানে—দিল্লীতে গমন করিলেন। মহম্মদ-ঘোরীর প্রতিনিধি কুতবুদ্দীন তখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দিল্লীতেও মহম্মদের আকৃতি তাঁহার মনোমত পদপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। হতাশ হইয়া, মহম্মদ অযোধ্যায় গিয়া, মালিক হুসামুদ্দীন আশুল্বকের শরণাগত হইলেন। হুসামুদ্দীন মহম্মদের ক্ষিপ্ৰকারিতার এবং সাহসের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে “ভগবত” এবং “ভিউলি” নামক দুইটি পরগণা জায়গীর দান করিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের জায়গীর দক্ষিণ বিহার বা মগধের পশ্চিম সীমা কর্মনাশা নদীর পশ্চিমে, চূনারগাড়ের নিকটে অরস্থিত ছিল। এখান হইতে মহম্মদ মাঝে মাঝে মগধে (বিহারে) প্রবেশ করিয়া, গ্রাম জুটপাট আরম্ভ করিলেন; এবং লুপ্তিত অর্থের দ্বারা ক্রমশঃ যুদ্ধের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র, এবং সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইলে, হিন্দুস্থানের যত খলজ্ বা খিলজি-বংশীয় তুর্কজ ছিল, তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সুলতান কুতবুদ্দীন মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের সুখ্যাতি শুনিয়া, তাঁহাকে ষ্টিলাত পাঠাইয়া দিলেন। প্রোৎসাহিত হইয়া, মহম্মদ পুনঃ পুনঃ “বিলায়ং

‘বিহার’ আক্রমণ করিয়া, অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। “এক দো সাল” এইরূপ আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলিল।

॥ বিহার-বিজয় ॥

অবশেষে মহম্মদ বিহার দুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। এই “কিল্লা-বিহার” পাটনা জেলার অন্তর্গত বর্তমান বিহার মহকুমার প্রধান নগর বিহার বলিয়া অনুমিত হয়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক “বিহার-দুর্গ”, এবং তৎপর বৎসর, “নোদিয়া” অধিকারের সময় লইয়া, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মতভেদ আছে। রেভাটির মতে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বিহার-দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।* ব্রহ্ম্ম্যান এই ঘটনা ১১৯৭ কি ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিতে চাহেন। ব্রহ্ম্ম্যানের অনুমানই সমীচীনতর বোধ হয়। “বিহার” এবং “নোদিয়া” অধিকারের বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান অবলম্বন—মিন্‌হাজ্জুদ্দীনের তবকাত্-ই-নাসিরি” নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থ।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে, কৃতবুদ্ধীন কর্তৃক দিল্লী অধিকারের বৎসরে, মিন্‌হাজ্জুদ্দীন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং সুলতান ইয়াল্‌তিমিসের এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে, প্রথমে গোয়ালিয়রের এবং পরে দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১২২২ খৃষ্টাব্দে প্রধান কাজির পদ ত্যাগ করিয়া, মিন্‌হাজ্জুদ্দীন বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন; এবং এখানে দুই বৎসরকাল অবস্থান করিয়া, দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই সুযোগেই, মিন্‌হাজ্জু বিহার এবং বাঙ্গালার তৎকালীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। “বিহার” এবং “নোদিয়া” অধিকারের ৬৫ বৎসর পরে, বিবরণ-সম্বন্ধে ত্রুতী হইয়া, মিন্‌হাজ্জুদ্দীন বৃদ্ধ সৈনিক এবং “বিশ্বস্ত লোকের” মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মিন্‌হাজ্জুদ্দীন যখন “তবকাত্” রচনায় প্রবৃত্ত, তখন অবশ্যই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের প্রবৃত্তিত প্রমাণ-পরীক্ষা-রীতি কাহারও জানা ছিল না, এবং তৎকালের জনসাধারণের শ্রায় মিন্‌হাজ্জেরও অতিপ্রাকৃত এবং আজগুবি কথায় বিশ্বাস স্থাপনের প্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু স্বধর্মে অনুরাগ এবং পৌত্তলিকতায় অশ্রদ্ধা, মিন্‌হাজ্জের শ্রায় লেখকগণকে স্বজাতির একান্ত পক্ষপাতী করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং মিন্‌হাজ্জ-বর্ণিত “বিহার” এবং “নোদিয়া”-অধিকারের বিবরণ বিশেষ বিচার পূর্বক গ্রহণ করা কর্তব্য।

* Raverty's Tabakat-i-Nasiri, App D.

“বিশ্বাসী লোকের” এবং ঐ ঘটনায় লিপ্ত একজন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখের কথা শুনিয়া, মিন্‌হাজ্জুদ্দীন বিহার-কিল্লা অধিকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার যখন “বিহার” আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে নিজামুদ্দীন এবং সমসামুদ্দীন এই দুই ভ্রাতা ছিল। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে মিন্‌হাজ্জুদ্দীন যখন “লখনাবতী” নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সমসামুদ্দীনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং সমসামুদ্দীনের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তিনি তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। বিহার-অধিকার-প্রসঙ্গের সূচনায় মিন্‌হাজ্জুদ্দীন লিখিয়াছেন,—“বিশ্বাসী লোকেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার, দুই শত বর্ষাচ্ছাদিত গাত্র অশ্বরোহী লইয়া, বিহারদুর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছিলেন ; এবং ঠাণ্ডা ঐ স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।” পরে সমসামুদ্দীনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—আক্রমণকারিগণ দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলে, “মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সাহসে ভর করিয়া, দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কিল্লা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং বিস্তর দ্রব্য লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং ইহীদের সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত ছিল। তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে অনেকগুলি পুস্তক ছিল। যখন এই সকল পুস্তক মুসলমানগণের নয়নগোচর হইল, তখন উহাদের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্ত তাঁহারা ৭-তকগুলি হিন্দুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; কিন্তু সমস্ত হিন্দুই নিহত হইয়াছিল। যখন তাঁহারা [প্রকৃত কথা] জানিতে পারিলেন, তখন দেখা গেল—“তামাম হিসার (দুর্গ) ও সহব একটা বিদ্যালয়, এবং হিন্দী ভাষায় বিদ্যালয়কে (মাদরাসাকে) ‘বিহার’ বলে।”*

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়,—মিন্‌হাজ্জুদ্দীন “কিল্লা বিহার” অধিকারের প্রকৃত বিবরণ জানিতে যথেষ্ট শ্রম স্রীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি যে শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে কত দুর্বল, তাহার দুইটি প্রমাণ পাওয়া গেল। তাহারা একটি বৌদ্ধ-বিদ্যালয়কে “কিল্লা” বলিয়া ভ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; এবং অনুসন্ধান করিয়াও, তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই রে—মুণ্ডিত-মস্তক বিহারবাসীরা ব্রাহ্মণ নহে, বৌদ্ধ শ্রমণ।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার “কিল্লা-বিহার” লুণ্ঠন করিয়া, বহু ধন লাভ করিয়াছিলেন। যে বৌদ্ধ-বিহার আক্রমণকারিগণের কিল্লা এবং সহব বলিয়া

* Raverty's Tabakat-i-Nasiri, pp. 551-552.

প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাতে যে বছ কালের বছ ভক্ত-জনের প্রদত্ত বছ গ্র্থ সঞ্চিত থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি? মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার এই কুণ্ঠিত ব্রব্য লইয়া, সন্ধ্যা দিল্লীতে কুতবুদ্দীন আইবকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুতবুদ্দীন তাঁহাকে বছ সন্মান করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন,—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, “বিহার জয় কারিয়াছিলেন [বিহার ফতে কর্দ]।” এই “বিহার ফতের” কথাটা অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। “বিহার” বলিতে এখন আমরা সাহা বুঝি, মিন্‌হাজুদ্দীন সে অর্থে বিহার-শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি সুলতান ইয়াল্‌তামাসের রাজত্বের বিবরণের শেষে, বিজিত প্রদেশ-সমূহের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে “বিহার” এবং “তিরহুত” স্বতন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। মিন্‌হাজের “বিহার” দক্ষিণ বা সাহাবাদ, বিহার, পাটনা, গয়া, মুসের, এবং ভাগলপুর জেলা। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার তিরহুত জয় করা দূরে থাকুক, কোন দিন উহার কোন অংশ আক্রমণও কারিয়াছিলেন না। বিহার শৈথিল্যে বা দুর্বলতায়, দক্ষিণ-বিহার মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের তায় সামান্য জায়গারদার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত লুণ্ঠিত এবং অবশেষে বিজিত হইতে পারিয়াছিল, সেহ “গৌড়েশ্বর” রাজধানীতে “বিহার ফতের” কাহিনী ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত করিয়া, নিবিরোধে বরেন্দ্র এবং রাঢ়দেশ অধিকারের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকিবে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অভ্যুদয়-কালে, যিনি উত্তরাপথের পূর্বাংশের প্রধান নরপাল বা “গৌড়েশ্বর” মিন্‌হাজের ভাষায় “হিন্দের রায়গণের পুরুষানুক্রমিক খালিফাস্থানীয়” ছিলেন, মিন্‌হাজুদ্দীন তাঁহাকে “রায় লখ্মনিয়া” এবং তাঁহার “দাব-উল্-মুল্ক” বা রাজধানীকে “সহর নোদিয়া” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মিন্‌হাজ “রায় পিথোরার” [চৌহান-রাজ পৃষ্ঠী-রাজের] এবং “রায় জয়চাঁদেব” [গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্রের] নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু “রায় লখ্মনিয়ার” জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিতেও যত্ন পাইয়াছেন; তাঁহার শাসনরীতির সুখ্যাতি করিয়াছেন; দানশীলতার জগু তাঁহাকে “সুলতান করিম কুতবুদ্দীন হাতেমুজ্জমান” বা সেই যুগের হাতেম কুতবুদ্দানের সহিত তুলনা করিয়াছেন; এবং উপসংহারে পৌত্তলিক-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন;—“আল্লা [নরকে] তাঁহার শাস্তির লাঘব করুন।”* এই “রায় লখ্মনিয়া” কে, তদ্বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজে বিস্তর

মতভেদ আছে। মিনহাজ্জুদ্দীনের “রায় লখ্‌মনিয়া” গোড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের নামের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। মিনহাজ্জুদ্দীন লখ্‌মনিয়ার যে জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনি “বিশ্বাসী লোকের” উক্তি (সেফাৎ-রোয়াৎ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতির বাহক এই সকল “বিশ্বাসী লোক” যঁাহাকে ভক্তির চক্ষে দেখেন, তাঁহার জীবনীকে অনেক অলৌকিক ঘটনায় সাজাইতে ভাল বাসেন। মিনহাজ্জুদ্দীন-লিখিত লক্ষ্মণসেনের জন্মবৃত্তান্ত, জন্মমাত্র রাজ্যাভিষেক, এবং সুদীর্ঘ-রাজ্যাশাসন-কাহিনী “বিশ্বাসী লোকের” কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। তবে মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের “নোদীয়া” আক্রমণের সময় লক্ষ্মণসেন ঐক অশীতিবর্ষীয় না হউন, বার্ককো পদার্পণ করিয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

॥ লক্ষ্মণাবতী ও নোদিয়া ॥

তাহার পর জিজ্ঞাস্য—“সহর নোদিয়হ্‌” কোন্‌ খানে ছিল? আবুল ফজল্‌ মিন্‌হাজ্জের “নোদিয়হ্‌কে” “নদীয়া” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বাঙ্কলায় সংস্কৃত-চর্চার গুরুস্থান নবদ্বীপই যে লখ্‌মনিয়ার “নদীয়া” তাহার আভাস দিয়াছেন। † আবুল্‌ ফজলের মতই এখন সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু আবুল্‌ ফজলের সময়ও, সকলে “নোদিয়হ্‌”কে “নদীয়া” বলিয়া মনে করিত না। “মুস্তখাব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌”-গ্রন্থে আবদুল কাদির বেদৌনি মিন্‌হাজ্জের “নোদিয়হ্‌”কে “নোদীয়া” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের দুইটি স্বতন্ত্র রাজধানী, ‘বিজয়পুর’ এবং ‘লক্ষ্মণাবতীর’ উল্লেখ পাওয়া যায়। “পবনদূতে” ধোয়ী কবি সুন্দা বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া এবং

“ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাত্তি দেবী (৩০)

সেই মুস্তবেণী (ত্রিবেণীর) উল্লেখ করিয়া,

“স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানী” (৩৬)

বর্ণন করিয়াছেন। “প্রবন্ধচিন্তামণি”-গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ আচার্য্য লিখিয়াছেন—“গোড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে—লক্ষ্মণসেন নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।” মিন্‌হাজ্জ লিখিয়াছেন, § “মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ঐ (রায় লখ্‌মনিয়ার) মূলুক সকল (মমলুকৎ) দখল (জব্‌ত) করিয়া সহর

† Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II, p. 148.

‡ Text (Bibliotheca Indica), Vol. I, p. 58,

§ Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 569; Text, p. 151.

নোদিয়হ্কে “খরাব” করিলেন, এবং যে মৌজা [এখন] লক্ষণাবতী, তাহার উপর রাজধানী (দার-উল্-য়ল্ফ) স্থাপন করিলেন।” এখানে দেখা যায়— মহম্মদ-ই-বখতিয়ার যেন লক্ষণাবতী নির্মাণ করিয়াছিলেন। “লক্ষণাবতী” লক্ষণাবতীর অপভ্রংশ। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার যে ইচ্ছাপূর্বক ঐ স্থানের নাম “লক্ষণাবতী” রাখিয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে। ঐ স্থানের নাম আগেই “লক্ষণাবতী” ছিল, এবং উহাই লক্ষণসেনের অগ্রতম রাজধানী ছিল। সেনরাজ্যগণের কৌত্তিচিহ্ন সেখান হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিম্বদন্তী অনুসারে, লক্ষণাবতী বা গোড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্তী বিশাল সাগরদীঘি লক্ষণসেন খোদাইয়াছিলেন ; এবং সাগরদীঘির অনতিদূরস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও “বল্লালগড়” নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষণসেনের অপর রাজধানী “বিজয়পুর” মিনহাজ্জদ্দীন কত্বক নোদিয়াহ্” নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। “পবনদূতের” প্রকাশক প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুত মনোমোহন চক্রবর্তী “নোদিয়াহ্” এবং “নদীয়া” অভিন্ন মনে করিয়া, নদীয়াই বিজয়পুর এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত [জনশ্রুতি অনুসারে] কুমার রাজার রাজধানী “কুমারপুরের” নিকটবর্তী বিজয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষপূর্ণ “বিজয়নগর”ই পবনদূতের “বিজয়পুর” বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নামানুসারে যে বিজয়পুরের নামকরণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সংশয় নাই, এবং “বিজয়নগরে” ও জনশ্রুতি অনুসারে এক বিজয় রাজা ছিল। দানসাগর-মতে বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব-স্থানে [বরেন্দ্রেই] “বিজয়নগর” অবস্থিত, এবং ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে বিজয়সেনের শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান “দেবপাড়া” অবস্থিত। দেবপাড়ার ‘পদ্মসহর’ নামক তল্লা বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্বায়েশ্বরের স্মৃতি এখনও জাগ্রত রাখিয়াছে, এবং “পদ্মসহরের” তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর লক্ষণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মিনহাজ্জের বর্ণনানুসারে ‘লক্ষণাবতী’ হইতে ‘নোদিয়া’ খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরকেই “নোদিয়াহ্” বলিতে প্রবৃত্তি হয়।

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার, কত্বক “কিল্লা-বিহার” অধিকারের বিবরণ সঙ্কলনে
কলকাতা নবম সংস্করণে মিনহাজ্জদ্দীন সেনের সেই লিপ্যন্তরে স্রষ্টা লিপির এক জন বন্ধ

সৈনিকের সাক্ষ্য গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, “নোদিয়াহ্”-অধিকার সম্বন্ধে তেমন কোন সাক্ষ্যৎ প্রস্তার মুখের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান নাই। “নোদিয়াহ্”-অধিকার-ব্যাপারে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন “বিশ্বাসযোগ্য লোকের” উক্তি। এই সকল “বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা”, অর্থাৎ ১২৪২—১২৪৩ খৃষ্টাব্দের লখনাবতীর তুরুক রাজপুরুষগণ, মিন্‌হাজকে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের এবং তাঁহার অনুচরগণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্ভবত খাঁটি খবরই দিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারেব “নোদিয়াহ্” প্রবেশের পূর্বে এবং তাঁহার পরোক্ষে নোদিয়ায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইঁহাদের প্রদত্ত বিবরণ তত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং মিন্‌হাজুদ্দীনের বর্ণিত মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক অধিকারের পূর্বেই নোদিয়া-বিবরণ বিশেষ বিচার পূর্বক গ্রহণ করা কর্তব্য; এবং যুক্তিবিরুদ্ধ অংশ অমূলক গুজব বলিয়া উপেক্ষণীয়। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন, “যখন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক “বিহার ফতে” হওয়ার সংবাদ রায় লখ্‌মনিয়ার রাজ্যের “আত্রাফে” পহঁছিল, তখন এক দল জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ-রাজমন্ত্রী রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল যে, পুরাকালের ব্রাহ্মণগণের পুস্তকে লেখা আছে যে, এই দেশ তুরুকগণের হস্তগত হইবে; এবং এই শাস্ত্রীয় ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবার সময়ও আসিয়াছে। সুতরাং সকলেরই এ দেশ হইতে পলায়ন করা উচিত। শাস্ত্রে লেখা ছিল, আজানুলস্বিতবাহ একজন তুরুক দেশ অধিকার করিবে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার আজানুলস্বিতবাহ কি না, দেখিয়া আসিবার জন্ম রাজা বিশ্বাসী চর পাঠাইলেন; চরেরা আসিয়া বলিল, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার যথার্থই জ্বাজানুলস্বিতবাহ। যখন এই সংবাদ নোদিয়ায় প্রচারিত হইল, তখন “ঐ মোজার” ব্রাহ্মণগণ এবং সাহাগণ (ব্যবসায়ীগণ) সঙ্কনতে, বঞ্চে, এবং কামরূপে (কামরূদে) চলিয়া গেল। কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়া যাওয়া রায় লখ্‌মনিয়ার পছন্দ “মাফিক” হইল না। সুতরাং মিন্‌হাজের মতে, যঁহার খান্দানকে (বংশকে) হিন্দের “রাইয়ান্” বা রাজগণ “বুজুর্গ” মনে করিত, এবং হিন্দের খলিফা বলিয়া স্বীকার করিত, এবং যঁহার ফরজন্দান্ [বংশধরগণ] “তবকত-ই-নাসারি” রচনার সময় [১২৬০ খৃষ্টাব্দ] পর্য্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্তা ছিল, সেই রায় লখ্‌মনিয়া একটি বৎসর জনশূন্য নদীয়ায় পড়িয়া রহিলেন।

“দোয়ম সাল (পরের বৎসর) মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লঙ্কর প্রস্তুত করিয়া, বিহার হইতে ধাবিত হইলেন; এবং সহস্রা নদীয়া সহরের নিকট এমন ভাবে উপস্থিত হইলেন যে, ১৮ জনের বেশী সওয়ার (অশ্বারোহী) তাঁহার সঙ্গে

ছিল না, এবং “দিগর লঙ্কর” পশ্চাতে আসিতেছিল। যখন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সহরের দরজায় পহঁছিলেন, কাহাকেও আঘাত করিলেন না, ধীর, স্থির ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহ মনে করিল না, ইনি-মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার; লোকে অনুমান করিল হযত একদল সওদাগর বিক্রয় করিবার জন্ত ঘোড়া আনিয়াছে। যখন রায় লখ্‌মনিয়ার বাড়ীর (সরাই) দরজায় পহঁছিলেন, তখন তলোয়ার খুলিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

“তখন রায় লখ্‌মনিয়া আহারে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সঠিক খবর পহঁছিবার পূর্বেই, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। তখন বৃদ্ধ রায় নগ্নপদে বাড়ীর পশ্চাত্তাগ দিয়া বহির হইয়া, সঙ্কনাতে ও বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। তথায় অল্পকাল পরেই তাঁহার রাজত্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।*

লক্ষণসেনের কাপুরুষতায় বাঙ্গালা তুরুস্কের পদানত হইল, ইদানীং অনেকেই এ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু মিন্‌হাজ্জুদ্দীন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি অক্ষরও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লখ্‌মনিয়াকে বা লক্ষণসেনকে “কাপুরুষ” না বলিয়া, বীরাগ্রগণ্য বলিয়া পূজা করাই সম্ভব। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সকলে নোদিয়া ছাড়িয়া সুদূর কামরূপে ও বঙ্গে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বীর লখ্‌মনিয়া নোদিয়া ছাড়িয়া এক পদও নড়িলেন না, একটি জনশূন্য রক্ষিশূন্য রাজধানীতে একটি বৎসর শত্রুর প্রতীক্ষায় রহিলেন। যখন শত্রু আসিল, তখন যে অপাত্তের হস্তে নগরদ্বার-রক্ষার ভার অপিত হইয়াছিল, তাহারা তুরুস্ক সওয়ারগণকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে বাধা দিল না। সতত শত্রুর প্রতীক্ষাকারী নগরদ্বার-রক্ষকগণ সশস্ত্র অশ্বারোহীদিগকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে নগর প্রবেশ করিতে দেয়, মিন্‌হাজ্জুদ্দীন ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক এরূপ অস্তুত ঘটনা বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যখন রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন খবর পাইয়া, যদি রক্ষকহীন অশীতিবর্ষের রাজ্য সরিয়া যাওয়া সম্ভব মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কাপুরুষ বলা যায় না।

তথাপি লক্ষণসেনের “নোদিয়া” হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না;—তাহা অজ্ঞ লোকের পরিকল্পিত উপকথা

মাত্র । বিশ্বরূপ এবং কেশব নামক লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য দুইটি পুত্র ছিল ; তিনি যাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত-পদ যৌবনে প্রধান মন্ত্রী-পদ, এবং যৌবনাশ্তে যৌবনশেষযোগ্য ধর্ম্মাধিকারির পদ প্রদান করিয়াছিলেন, হলায়ুধের স্ত্রায় এরূপ হাতেগড়া অমাত্য ছিল ; এবং তিনি যাঁহাদিগকে লইয়া কাশী হইতে কামরূপ পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এরূপ সৈন্যসামন্তও ছিল । মিন্‌হাজ লখ্মনিয়াকে যেরূপ প্রজারঞ্জনকারী এবং দানশীল রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি অনেকের ভক্তিও আকর্ষণ করিয়াছিলেন । সুতরাং, এরূপ নৃপতিকে বারুক্যে সকলে দল বাঁধিয়া শত্রুর দ্বারা পদদলিত হইবার জন্য “নোদিয়ায়” ফেলিয়া আসিবে, এবং এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজ খবর লইবে না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । অনুমান হয়—যখন “ব্রাহ্মণগণ” এবং “ব্যবসায়িগণ” নোদিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন “নোদিয়ার” অধীশ্বরও তখন রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন । মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক এরূপ নিষ্ক্রিমবাদে পশ্চিম-বরেন্দ্র অধিকারের প্রকৃত কারণ এই যে,—যখন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পহুঁছিয়াছিল, তখনই হয়ত ভয়াতুর মন্ত্রিবর্গের উপদেশে লক্ষ্মণসেন (পূর্বে) বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এবং তাহার অনতিকাল পরে [তুরস্ক নায়কের “দোয়ম সালে”, নোদিয়া-আক্রমণের পূর্বে] পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন । লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের যে দুইখানি ভ্রাতৃত্বশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একখনিতে লক্ষ্মণসেন-পাদানুধ্যাত বিশ্বরূপসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে ; এবং আর একখনিতে অপর একটি নাম বিলুপ্ত করিয়া, লক্ষ্মণসেন-পাদানুধ্যাত কেশবসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ইহাতে মনে হয়—লক্ষ্মণসেনের অভাবে, সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । লক্ষ্মণসেনের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে,—এই ভ্রাতৃবিরোধ-বহিঃ প্রধুমিত হইবার সময়ে,—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর পাইয়া থাকিবেন ।

